জানা অজানা

সুকুমার রায়



সুকুমার রায়

জানা অজানা

এ পি পি
১৬৬ কেশব সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯

Jana Ajana
by
Sukumar Roy

প্রথম প্রকাশ / মার্চ, ১৯৮৩

প্রচ্ছদ / অনীশ দেব

অভীক রায় কর্তৃক এ পি পি ১৬৬ কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯
হইতে প্রকাশিত এবং এ পি পি প্রেস ১১৭ কেশব সেন
স্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।

দশ টাকা

নথিপত্রের হিসেবে দেখা যায় ১৯১৩ থেকে ১৯২৩, অর্থাৎ মৃত্যুর বছর পর্যন্ত, সুকুমার বিজ্ঞান-বিজ্ঞানী ও প্রাসঙ্গিক কৌতূহল জাগিয়ে-তোলা নানান বিষয় সহজ ও আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে পরিবেশন করেছিলেন 'সন্দেশ' পত্রিকার পাতায়। আরও জানা যায়, ১৯১৩ সালের মে-মাসে উপেন্দ্র-কিশোরের সম্পাদনায় ঘটেছিল 'সন্দেশ' পত্রিকাটির আবির্ভাব, এবং সেই বছর থেকেই লেখক-শিল্পী সুকুমারের আত্মপ্রকাশ। উপরোক্ত সন-তারিখ উল্লেখের উদ্দেশ্য একটাই—বিজ্ঞান ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের প্রতি সুকুমারের অনমনীয় আকর্ষণ প্রতিপন্ন করা।

রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানে ডাবল অনার্স নিয়ে বি-এস-সি পাশ করেছিলেন সুকুমার, ফলে বিজ্ঞানমনস্কতা এবং যোগ্যতা—এ-দুটি জিনিসই তিনি অর্জন করেছিলেন সহজে। এ-দুটি গুণের সঙ্গে মিলিত হল তাঁর অসামান্য সরস-সাবলীল প্রকাশভঙ্গী—যেন ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটল। বিজ্ঞান-রচনার দুর্লভ কিছু মণিরত্ন উপহার পেল আমাদের সাহিত্য যা চিরকাল সযত্নে লালন করার মত।

সুকুমারের বিজ্ঞান-লেখার আশ্চর্য কয়েকটি গুণ হল, এতে পাণ্ডিত্যের প্রকাশ নেই, পরিভাষার জটিলতা নেই। ফলে তার লেখা পড়তে পড়তে ছোট-বড় সকলেই ক্রমে লেখকের অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। এ-জাতীয় সাফল্য বাঙলা-সাহিত্যে দুর্লভ। ১৯৩৭-এ রবীন্দ্র-নাথ 'বিশ্বপরিচয়' লিখেছিলেন। বইটির উৎসর্গপত্রে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উদ্দেশ করে যে বক্তব্য কবি রেখেছিলেন তারই অংশবিশেষ এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে: 'পাণ্ডিত্য বেশী নেই, সুতরাং সেটাকে বেমালুম করে রাখতে বেশি চেষ্টা পেতে হয়নি। চেষ্টা করেছি ভাষার দিকে। বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্যে পারিভাষিকের প্রয়োজন আছে। কিন্তু পারিভাষিক চর্ব্যজাতের জিনিস। দাঁত ওঠার পরে সেটা পথ্য। সেই কথা মনে করে যতদূর পারি পরিভাষা এড়িয়ে সহজ ভাষার দিকে মন দিয়েছি।...'

রবীন্দ্রনাথের সফলতায় সন্দেহ নেই, কিন্তু উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হয় সুকুমারের বিজ্ঞান-লেখার কর্মযজ্ঞ অন্তত দু'দুটি কারণে রবীন্দ্রনাথের তুলনায় সুকুমারের ব্রত দুরূহতর ছিল : প্রথমতঃ সুকুমার বিজ্ঞানচর্চায় ব্রতী হন রবীন্দ্রনাথের দুই যুগ আগে ; দ্বিতীয়তঃ, তাঁকে পাণ্ডিত্য 'বেমালুম করে রাখতে' চেষ্টা পেতে হয়েছিল। সবরকম গুণাগুণ থাকা সত্ত্বেও সুকুমারের বিজ্ঞান-রচনা হয়ত 'বিশ্বপরিচয়'-এর তুলনায় অনেক কম পঠিত। তার কারণ হিসেবে বলা যায়, এই লেখাগুলি কখনও পৃথক সংকলনরূপে আত্মপ্রকাশ করেনি—একমাত্র জীবজন্তু' গ্রন্থটি ছাড়া। সম্প্রতি এই অভাব পূরণের প্রচেষ্টায় অগ্রণী হয়ে এ পি পি নিঃসন্দেহে সকলের ধন্যবাদের পাত্র হবেন। সুকুমারের বিজ্ঞান লেখার যে তিনটি বই তাঁরা প্রকাশ করতে চলেছেন তার পথিকৃত এই 'জানা অজানা'। বর্তমান গ্রন্থে মোট আঠাশটি নিবন্ধ গ্রথিত হয়েছে : নিবন্ধগুলির প্রকাশকাল ১৯১৪ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখের প্রয়োজন, নিবন্ধগুলি কালানুক্রম অনুসারে সংকলিত হয়নি, বরং সৃষ্টি ও বিনাশের মধ্যবর্তী পথের ধারাবাহিকতা যথাসম্ভব অনুসরণ করা হয়েছে—যে কারণে 'নীহারিকা' 'সূর্যের কথা' 'মানুষের কথা' ইত্যাদি রচনায় গ্রন্থের সূচনা, এবং 'পৃথিবীর শেষ দশা'য় তার ইতি। আরো একটা জরুরী তথ্য উল্লেখের প্রয়োজন। সুকুমারের বর্তমান নিবন্ধগুলি ছয় দশক কি তারও বেশি পুরনো, ফলে বিজ্ঞানের কোন কোন শাখায় অগ্রগতির প্রভাব নিবন্ধগুলিতে স্বাভাবিক কারণেই অনুপস্থিত। অবশ্য এতে পাঠকের ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা নেই বলেই আমাদের বিশ্বাস, কারণ সুকুমারের রচনা যদি পাঠকের প্রকৃত অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলতে পারে, তাহলে বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কৃত তথ্যগুলি পাঠক নিশ্চয়ই অন্যান্য আকরগ্রন্থের শরণাপন্ন হয়ে জেনে নেবেন। যদি কার্যত তাই ঘটে, তাহলে সেটাই হবে সুকুমারের সাফল্যের চূড়ান্ত নজীর।

ফলিত পদার্থ বিভাগ
বিজ্ঞান কলেজ, কলকাতা

অনীশ দেব

জানা অজানা



নীহারিকা

তোমরা আকাশে 'কালপুরুষ' দেখিয়াছ ? এই ফাল্গুন মাসে প্রথম রাত্রে যদি দক্ষিণমুখী হইয়া দাঁড়াও তবে প্রায় মাথার উপর এই 'কাল-পুরুষ'কে দেখিতে পাইবে, আর একবারটি যদি তাহাকে চিনিয়া রাখ তবে আর কোনদিন ভুলিবে না।

পৃথিবীর যেমন মানচিত্র বা 'ম্যাপ' হয়, আকাশের তেমনি মানচিত্র আছে। এই রকমের অনেক মানচিত্রে আকাশের তারার সঙ্গে অনেক অদ্ভুত ছবি আঁকা থাকে। তাহার মধ্যে যদি কালপুরুষ বা ওরিয়ন-এর ছবি খুঁজিতে যাও, তবে হয়ত দেখিবে একটা হাত-পাশুদ্ধ মূর্তি আঁকা আছে কিন্তু আকাশে খুঁজিলে অবশ্য সে রকম কোন চেহারা পাইবে না—দেখিবে কেবল ঐ তারাগুলি।

আকাশের গায়ে যে এত হাজার হাজার তারা ছড়ান রহিয়াছে, মানুষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই তাহার মধ্যে নানারকম ছবি ও মূর্তির কল্পনা করিয়া আসিতেছে। কতগুলো তারা মিলিয়া হয়ত অর্ধচন্দ্রের মতো দেখায়, মানুষে বলিল 'ওটা ধনুকের মতো।' কোনটা হয়ত মুকুট, কোনটা ষাঁড়ের মাথা, কোনটা ভাল্লুক, কোনটা যমজ ভাই কোনটা যোদ্ধা, এইরূপ নানারকম কল্পনার মূর্তিতে সমস্ত আকাশটিকে ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেক সময় এ সকল কল্পনাকে নিতান্তই আজগুবি বলিয়া মনে হয় কিন্তু এই কালপুরুষের বেলা বোধহয় কল্পনাটা বেশ খাটিয়াছে। দুই হাত দুই পা আর মাথা সবই মিলিতেছে, তাহার উপর আবার কোমরবন্ধ। তলোয়ারটি পর্যন্ত বাদ যায় নাই। এত কথা যে বলিলাম সে কেবল ঐ তলোয়ারটির জন্য। ঐ তলোয়ার-টার দিকে একবার ভাল করিয়া দেখ দেখি; তিনটি তারার মধ্যে

মাঝেরটি একটু কেমন কেমন দেখায় না ? আর সবগুলি তারা পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে হীরার টুকরার মতো, কিন্তু এটা যেন একটু ঝাপসা ঠেকে। শুধু চোখে এই পর্যন্ত ; কিন্তু দূরবীন দিয়ে দেখ, আরও তফাৎ দেখিবে। যত বড়ই দূরবীন কষো না কেন, আর সব তারাগুলিকে কেবলি ঝিক্‌মিকে হীরার মতো দেখিবে কিন্তু এই তারা'টিকে দেখিবে যেন সাদা মেঘের মতো। আকাশে এই রকন মেঘের মতো জিনিস আরও অনেক দেখা যায়—ইহাদের নাম নীহারিকা, ইংরাজীতে বলে নেবুলা।

পণ্ডিতেরা বলেন, এই নীহারিকাগুলি এককালে তারা হইবে এবং এই তারাগুলাও এককালে নীহারিকা ছিল। আমরা যাহাকে সৌর-জগৎ বলি—এই সূর্য এবং গ্রহ উপগ্রহশুদ্ধ তাহার বিশাল পরিবারটি—এই সমস্তই এককালে কোন এক প্রকাণ্ড নীহারিকার মধ্যে খিচুড়ি পাকাইয়া ছিল। সে যে কত বড় ব্যাপার তাহা কল্পনাও করা যায় না। সেই নীহারিকা আকাশের একটা প্রকাণ্ড কোণ জুড়িয়া জ্বলন্ত বাষ্পের মতো দপদপ করিয়া জ্বলিত। তাহার মধ্যে না ছিল চন্দ্র সূর্য না ছিল পৃথিবী।

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কাহারও স্থির হইয়া থাকিবার নিয়ম নাই, একটা কণাপ্রমাণ বস্তু আর একটি কণাকে পাইলে এ উহাকে টানিয়া লয়, দশটা কণা একত্র হইলেই পরস্পরের দিকে ছুটিয়া জমাট বাঁধিতে চায়। সুতরাং এত বড় নীহারিকাটি যে স্থির হইয়া থাকিবে, এমন উপায় ছিল না—সে আপনার ভিতরকার টানাটানির মধ্যে পড়িয়া ঘুরপাক খাইতে লাগিল আর তাহার মধ্যখানে প্রকাণ্ড একটা বাষ্পের ঢিপি জমাট হইতে লাগল। এই জমাট ঢিপিকেই এখন আমরা সূর্য বলি।

কালপুরুষের নীহারিকার চেহারা একবার দেখ—ঐ জমাট মেঘের মতো জিনিসটার ভিতর হইতে কত ডালপালা বাহির হইয়াছে ; ঐ ডালপালাগুলি আবার আলগাভাবে জমাট বাঁধিয়া গ্রহ উপগ্রহের সৃষ্টি করিবে। ঘুরন্ত চাকার গা হইতে যেমন করিয়া কাদা ছিট্‌কাইয়া যায়, এক একটা নীহারিকার চক্র হইতে ঠিক সেই রকম জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড

ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে। দেখিতে অবশ্য সমস্ত নীহারিকাটি স্থির দেখা যায়—কারণ, জিনিসটা এত দূরে যে ঘণ্টায় লক্ষ মাইল বেগে ছুটিলেও এখান হইতে তাহাকে একেবারে স্তব্ধ দেখা যাইবে।

আকাশে এই রকম নীহারিকা কত যে আছে, তাহার আর অন্ত নাই। কোনটা একেবারে ঝাপসা কুয়াশার মতো কোনটার মধ্যে সবে একটু জমাট বাঁধিতেছে, কোনটা রীতিমত গোল পাকাইয়া উঠিতেছে। এক একটার চেহারা ঠিক যেন ঘুরন্ত চরকি বাজির মতো মনে হয় যেন জ্বলন্ত চক্র হইতে আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। আবার এমন নীহারিকাও আছে যাহাকে এখন দেখিতে ঠিক তারার মতোই দেখায়; সে যে এক সময়ে নীহারিকা ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ এখনও তাহার আশেপাশে অতি ঝাপসা কুয়শার মতো নীহারিকার শেষ নিশ্বাসটুকু লাগিয়া আছে। সে এত ঝাপসা যে, অনেক সময় খুব বড় দূরবীক্ষণ দিয়াও তাহার কিছুমাত্র ধরা যায় না, ধরা পড়ে কেবল ফটোগ্রাফের প্লেটে।

ফটোগ্রাফের প্লেটে কেমন করিয়া ছবি তোলে দেখিয়াছ ত? ক্যামেরার ভিতর হইতে সে টুক করিয়া একটিবারমাত্র তোমার দিকে তাকায় আর ঐ এক দৃষ্টিতেই তোমার চেহারার ছাপটুকু নিজের মধ্যে ধরিয়া লয়। সে একবার যাহা ভাল করিয়া ধরে তাহা আর ভুলিতে চায় না। এক মিনিট খুব ঝাপসা জিনিসের দিকে তাকাইলে মানুষের চোখ শ্রান্ত হইয়া পড়ে, সে তখন আর ভাল দেখে না; কিন্তু ফটোগ্রাফের প্লেট যত বেশি করিয়া তাকায় ততই বেশি দেখিতে পায়। এমনি করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইয়া সে ঐ অন্ধকারের মধ্যেই অনেক আশ্চর্য জিনিসের সংবাদ বাহির করে। এই রকম ফটোগ্রাফ দেখিলে বোঝা যায় যে, সমস্ত আকাশটাই প্রায় নীহারিকায় ঢাকা—আকাশের যেদিকে তাকাও সেইদিকেই নীহারিকার জাল।

সূর্যের কথা

সূর্যটা একটা গোল আগুনের পিণ্ড, এ কথা আমরা সকলেই জানি। গোল, সেটা চোখেই দেখতে পারি—আর 'আগুন' কিনা তা একটিবার দুপুর রোদে দাঁড়ালেই আর বুঝতে দেরি লাগে না। পণ্ডিতেরা বলেন, এই পৃথিবীটার মতো তেরো লক্ষ পিণ্ডের তাল পাকালে তবে এই সূর্যের সমান বড় হয়। তাঁরা কেমন করে জানলেন? যাঁরা জরিপ করেন তাঁরা জানেন, খুব দূরের জিনিসকে নানারকমে পরখ করে এমন হিসাব পাওয়া যায় যা থেকে চট করে বলা যায় যে জিনিসটা কতখানি দূরে। এই কৌশলটি পণ্ডিতেরা সূর্যের উপর খাটিয়েছেন। পৃথিবীর দুই জায়গায় দুইজন লোক বসে সূর্যটাকে খুব সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন, কোন সময়ে সেটাকে আকাশের ঠিক কোন জায়গায় দেখা যায়—এবং দুজনের হিসাব মিলিয়ে অঙ্ক কষে বলেছেন যে সূর্যটা এখান থেকে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে। সে যে কতদূর তা আমাদের কল্পনাতেই আসে না। একটা এঞ্জিন যদি ঘণ্টায় ৬০ মাইল করে ক্রমাগত ছুটে আজ সূর্যের দিকে রওয়ানা হয়, সে ১৭৭ বছর পরে (২০৯৩ খ্রীষ্টাব্দে) সূর্যে গিয়ে পৌঁছাবে। পণ্ডিতেরা এই সকল মাপ নিয়ে বলছেন যে ঐ সূর্যের পাশে পৃথিবীটাকে বসালে সেটা দেখাবে যেন একটি তরমুজের পাশে একটি মুসুরির ডাল।

সূর্যটা কিসের তৈরি? সূর্যের আলোক পরীক্ষা করে পণ্ডিতেরা বলেন যে, পৃথিবীটা যা দিয়েই তৈরি। তবে সেইসব মাল-মসলা জমে এখানে যেমন জল মাটি পাথর হয়েছে সেখানে তা হবার যো নেই—কারণ, সেখানকার সর্বনেশে গরমে সব জিনিস সত্য সত্যই আগুন হয়ে উঠে। লোহা শুধু গলে যায় তা নয়, ফুটন্ত জলের মতো টগবগ্ করে

বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। এই ফুটন্ত আগুন আর জ্বলন্ত বাষ্প সূর্যের চারিদিক ঘিরে লক্‌লক্‌ করতে থাকে। শুধু চোখে মনে হয় সূর্যটা বেশ একটি মোলায়েম গোল জিনিস, তার গায়ে কোথাও আঁচড়ের দাগটি পর্যন্ত নেই। কিন্তু আসলে তা নয়। ভাল দূরবীন দিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, তার সমস্ত গা ভরে আগুনের চিক্‌মিকি খেলছে— আগুনের সমুদ্রে আগুনের ঢেউ, তার মধ্যে বড় বড় আগুনের ডেলা পাগলের মতো ডুবছে আর ভাসছে। তাছাড়া সূর্যের গায়ে প্রায়ই ছোট বড় ফোসকা দেখা যায়, ফোসকাগুলি তত উজ্জ্বল নয়, তাই দেখতে হঠাৎ কালো দেখায়। জলের মধ্যে যেমন বুদবুদ ওঠে সূর্যের গায়ে তেমনি আগুনের ফোসকা ওঠে আর ফেটে পড়ে। একটি বুদবুদ মাঝে মাঝে এত বড় হয় যে, কালো কাচ দিয়ে দেখলে সে গুলোকে শুধু চোখেই দেখতে পার। এরকম এক একটা বুদবুদের মধ্যে ইচ্ছে করলে, দু-দশটা পৃথিবীকে স্বচ্ছন্দে পূরে রাখা যায়। ঐ ফোসকাগুলি এক একটি আগুনের ঘূর্ণিচক্র, তার চারিদিকে দমকা আগুন ঠেলে উঠছে।

সূর্যের তেজ এত বেশি যে তার চারিদিকে যে আগুনের শিখা ঝড়ের মতো উঠছে আর পড়ছে, সেগুলি আমরা দেখতেই পাই না। সূর্যের যখন পূর্ণগ্রহণ হয়, চাঁদটা মাঝে পড়ে তার চকচকে শরীরটিকে আড়াল করে ফেলে, তখন তাদের চেহারা দেখা যায় আগুনের লকলকে জিভের মতো। শিখাগুলি হাজার হাজার মাইল জুড়ে দপ দপ করে জ্বলতে থাকে, তখন আগুনের ঝাপটা দিয়ে মিনিটে ছয় হাজার মাইল ছুটে যায়, কখন শান্ত মেঘের মতো সূর্যের গায়ে ভেসে বেড়ায়। এক একটাকে দেখে মনে হয় যেন আগুনের ফোয়ারা উঠছে। তার মধ্যে যদি আমাদের এই পৃথিবীটিকে ছেড়ে দেও, একটি চক্ষের নিমিষে গলে বাষ্প হয়ে কোথায় যে মিলিয়ে যাবে সে আর খুঁজেই পাবে না। সূর্যের চারিদিকের এই অগ্নিমেঘের স্তরটিকে দিনের আলোতে দেখবার জন্য পণ্ডিতেরা আশ্চর্যরকম উপায় বার করেছেন,

তার জন্য তাঁদের এখন আর গ্রহণের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় না।

কিন্তু সূর্যের চারিদিকে আর একটি জিনিস আছে যেটিকে গ্রহণ ছাড়া দেখবার যো নেই সেটিকে সূর্যের কিরীট (কোরোনা) বলা যায়। পৃথিবীর চারিদিকে যেমন বাতাসের আবরণ সূর্যের চারিদিকেও তেমনি বহুদূর পর্যন্ত এই কিরীটের ঢাকনি। যারা সূর্যের পূর্ণগ্রহণ দেখেছেন তাঁরা বলেন, এমন আশ্চর্য অদ্ভুত দৃশ্য আর কিছু নেই। যখন গ্রহণ সম্পূর্ণ হয়ে আসতে থাকে, চাঁদের কালো ছায়া যখন চোখের সামনে পাহাড় সমুদ্র সব গ্রাস করে ফেলতে থাকে, আকাশের অদ্ভুত ফ্যাকাশে রং আর পৃথিবীর অন্ধকার দেখে, পশুপাখি পর্যন্ত ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়, সেই সময়ে সূর্যের তেজ চাপা পড়ে তার আশ্চর্য কিরীটের শোভা দেখা যায়। শুধু এই কিরীটের সুন্দর স্নিগ্ধ আলো দেখবার জন্যই কত লোকে পয়সাকড়ি খরচ করে হাজার হাজার মাইল পার হয়ে গ্রহণ দেখতে যায়। এই কিরীটের চেহারা সব সময়ে এক রকমের থাকে না—কখন সেটা চারিকে বেশ সমান ভাবে, গোল হয়ে থাকে, কখন তার মধ্যে ভয়ানক ঝাপটার লক্ষণদেখা যায়—কখন তা থেকে লম্বা লম্বা ছটা বেরিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। মোটের উপর বলা যায়, যে সময়ে সূর্যের গায়ে ফোসকা বেশি দেখা যায় সেই সময়ে তার আগুনের শিখাগুলিরও অত্যাচার বাড়ে আর সেই অত্যাচারে তার কিরীটটিকেও ঘাঁটিয়ে তোলপাড় করে তোলে। আমরা জানি যে পৃথিবীটা ২৪ ঘণ্টায় একবার পাক খায়, তাতেই আমাদের দিনরাত হয়। সূর্যটাকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সেও ভয়ংকর বেগে লাটুর মতো ক্রমাগত পাক খাচ্ছে—কিন্তু একটি পাক খেতে তার ছাব্বিশ দিন সময় লাগে।

অনেকের বিশ্বাস এই যে, সূর্যটা এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে আছে—আর পৃথিবী গ্রহ চন্দ্র সবাই মিলে ঘুরতে ঘুরতে তার চারিদিক প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু আসলে তা নয়—বিশ্বজগতে কারও স্থির হয়ে

বসে থাকবার হুকুম নেই। আমাদের এই পৃথিবী এবং আর সমস্ত গ্রহকে নিয়ে সূর্য ভয়ানক বেগে শূন্যে ছুটে চলেছে।

শুনলে হঠাৎ হয়তো মনে হতে পারে, এমন সাংঘাতিকভাবে চলতে গিয়ে হয়ত কোন্‌দিন কোন্ তারার সঙ্গে ঢুঁ লেগে যাবে—কিন্তু সেরকম ভয়ের কোন কারণ নেই। এইসব তারাগুলি এক একটি এত দূরে যে সূর্যটা দশ লক্ষ বৎসর এইভাবে ছুটলেও কোন তারার কাছে পৌঁছাবার সম্ভাবনা নেই। তোমরা হিসাব করে দেখ—এক ঘণ্টায় যদি ২০০০০ মাইল যাওয়া যায় তাহলে দশ লক্ষ বৎসরে কত মাইল? ২০০০০ × ২৪ ৩৬৫ × ১০০০০০০। তাহলে এক একটি তারা কতখানি দূরে একবার ভাবতে চেষ্টা কর।



মানুষের কথা

জগতে কাহারও স্থির থাকিবার হুকুম নাই। জ্যোতির্বিদ বলেন, 'চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র পৃথিবী সমস্তই চলিতেছে।' জড় বিজ্ঞানের পণ্ডিত বলেন, 'প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে তাহার অতি সূক্ষ্ম অণুপরমাণু পর্যন্ত ছুটাছুটি করিতেছে।' ভূতত্ত্ববিদ বলেন, 'এই পৃথিবীকে আজ যেমন দেখিতেছি, চিরদিন সে এমন ছিল না এবং পরেও এমন থাকিবে না—তাহার চেহারা পর্যন্ত যুগের পর যুগ বদলাইয়া চলিয়াছে।' সুতরাং মানুষ যে চিরকাল মানুষ ছিল না, সে যে ক্রমে এইরকম ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহা কিছুই আশ্চর্য কথা নয়। কোন আদিম কালের কোন্ জন্তু কেমন করিয়া ক্রমে মানুষের মতো হইয়া উঠিল, তাহার সমস্ত ইতিহাস জানিবার কোন উপায় নাই। যতটুকু জানা যায় তাহাতে মানুষের সঙ্গে বানরের, বিশেষত 'বনমানুষের' জ্ঞাতি সম্পর্কটাই স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

চোখে দেখিতে মানুষ ও বানরের চেহারার মধ্যে যেমন মিল দেখিতে পাই তেমনি কতগুলা তফাৎ বুঝিতে পারি, যাহার দরুণ বানরকে বানর বলিয়া বোঝা যায়। একটা মানুষের আর একটা গরিলার কঙ্কাল পাশাপাশি লইয়া দেখিবে শরীরের গড়ন মোটামুটি একই রকমের; একইরকম ভাবে হাড়ের পরে হাড় সাজাইয়া কাঠাম দুটিকে দাঁড় করান হইয়াছে। বাঘ সিংহ বা গরু ঘোড়ার কঙ্কাল যদি ইহার পাশে বসাও তবে কখনই এতটা মিল দেখিতে পাইবে না। কিন্তু এতটা মিল থাকিলেও দুয়ের মধ্যে তফাৎটাও বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়। গরিলার হাত প্রকাণ্ড লম্বা এবং মজবুত কারণ তাহাকে গাছে গাছে ফিরিতে হয়, চলিতে-ফিরিতে তাহাকে হাতের ব্যবহার করিতে হয়। গরিলার পায়ের

পাতা ঠিক হাতেরই মতো অর্থাৎ বলিতে গেলে তাহার চারিটাই হাত। তাহার শরীরে যে অসাধারণ শক্তি, তাহার পাঁজরের হাড়গুলা দেখিলেই সেটা বেশ বোঝা যায়। তারপর মাথার খুলিটা—গরিলার দাঁত এবং চোয়াল খুব মজবুত কিন্তু আসল মাথাটুকু অর্থাৎ মগজের জায়গাটুকু মানুষের তুলনায় খুব ছোট। মানুষকে বুদ্ধি খাটাইয়া বাঁচিতে হয়, তাই তাহার মগজ বাড়িয়া মাথাটাকে বড় করিয়া তুলিয়াছে। আরও কতগুলা সূক্ষ্ম তফাৎ আছে পণ্ডিতেরা যাহাকে খুব গুরুতর বলিয়া মনে করেন, যেমন হাঁটুর হাড়। মানুষ যে পায়ের পাতার উপর খাড়া হইয়া চলে এবং গরিলা যে সামনের হাত দুটিতে ভর রাখিয়া কুঁজা হইয়া চলে, হাঁটুর হাড় দেখিয়াই পণ্ডিতেরা তাহা বলিয়া দিতে পারেন।

মানুষ কতদিন হইল এ পৃথিবীতে আসিয়াছে অর্থাৎ কতদিন হইল সে 'মানুষ' হইয়াছে, তাহা পণ্ডিতেরা এখনও ঠিক করিতে পারেন নাই। সকলের চাইতে পুরাতন মানুষের চিহ্ন যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের চোয়ালের হাড় আর মুখের ভিতরকার গড়ন দেখিয়া মনে হয় তাহারা কথা বলিতে জানিত না। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ডুবর যবদ্বীপে প্রাচীন জন্তুর কঙ্কাল খুঁজিতে গিয়া একটা মানুষের কয়েক টুকরা কঙ্কাল খুঁড়িয়া তোলেন। সেটা মানুষের কঙ্কাল কি বানরের কঙ্কাল, সে বিষয়ে প্রথমে একটু সন্দেহ ছিল—কারণ তাহার মগজকোষটি বানরের চাইতে অনেকটা বড় হইলেও আজকালকার সভ্য মানুষের তুলনায় খুবই ছোট এবং কপালটাও বানরের মতো চ্যাপ্টা। তাহার দুইটা দাঁত পাওয়া গিয়াছিল, সে দুইটা দেখিলে গরিলার দাঁতের কথাই মনে হয়। কিন্তু তাহার উরুর হাড় দেখিয়া স্পষ্ট বোঝা গেল যে সে মানুষের মতো খাড়া হইয়া চলিত। এই প্রাচীন মানুষটির অর্থাৎ জন্তুটির নাম দেওয়া হইয়াছে বানর-মানুষ। ইহার চাইতে প্রাচীন কোন মানুষের কঙ্কাল আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

ইউরোপে সেকালের মানুষের যে সকল চিহ্ন পাওয়া যায়, এই বানর-মানুষের তুলনায় তাহাদের খুব প্রাচীন বলা চলে না। কিন্তু

তাহারাও এক একজন প্রায় পাঁচ লক্ষ বৎসর আগেকার মানুষ। ধনুকের মতো বাঁকা ছোট ছোট পা, বানরের মতো উঁচু উঁচু ভ্রূ, একটু-আধটু কথা বলতে পারে—সেইসব মানুষ এখন পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়াছে। এইসব মানুষের চেহারা কেমন ছিল তাহা এই সকল কঙ্কাল হইতেই কতকটা বোঝা যায়।

মানুষ যখন সভ্য হয় নাই, যখন সে অস্ত্র গড়িতে বা আগুন জ্বালাইতে শিখে নাই, তাহারও অনেক আগে সে এমন বিদ্যা শিখিয়াছিল যাহা মানুষ ছাড়া অন্য কোনও পশুর জানা নাই। সেই বিদ্যাটি খাড়া হইয়া চলিবার বিদ্যা। কেবলমাত্র পায়ের সাহায্যেই যখন সে চলিতে শিখিল তখন হইতে তাহার হাত দুইটা ছাড়া পাইল। সেই সময় হইতে সে হাত দুটাকে যে কতরকম কাজে লাগাইয়াছে এবং কত কৌশল শিখিয়াছে তাহার আর অন্ত নাই!

সেইসব মানুষেরা যে সকল চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে পরিষ্কার দেখা যায় যে, হাতের ওস্তাদি কেমন করিয়া যুগের পর যুগ বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রথম যে মানুষ অস্ত্রের ব্যবহার করিতে শিখে, তাহার অস্ত্র ছিল গাছপাথর জানোয়ারের শিং ও হাড়। এই অতি প্রাচীন মানুষটি যদি অস্ত্রশস্ত্রের আরও উন্নতি করিতে পারিত, তবে হয়ত সে আরও কিছুকাল টিঁকিয়া থাকিত! কিন্তু পাথরের অস্ত্রওয়ালা মানুষের সঙ্গে সে পাল্লা দিয়া পারে নাই। প্রাচীনকালের নানারকম পাথরের অস্ত্র পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই পাওয়া গিয়াছে। সব চাইতে পুরান যেগুলি সেগুলিকে হঠাৎ দেখিয়া অস্ত্র বলিয়া বুঝা যায় না, কারণ সে সময়ে এক এক টুকরা পাথরকে ঠুকিয়া ঠুকিয়া নিতান্তই মোটা রকমের, উবড়োখাবড়ো অস্ত্র গড়া হইত। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এইরকম অস্ত্রের সাহায্যে তাহারা পৃথিবীতে শিকার করিয়া ফিরিয়াছিল। যে সকল পর্বতের গুহায় তাহারা বাস করিত সেই গুহার মধ্যে পাথরে আঁচড় কাটিয়া তাহারা যে সকল ছবি আঁকিত, তাহারও চিহ্ন পর্যন্ত গিয়াছে। সেই ছবিগুলি দেখিলে তোমরা হয়ত হাসিবে—কারণ

আজকালকার পাঁচ-শত বৎসরের শিশুও অমন ছবি আঁকিতে পারে। কিন্তু পণ্ডিতেরা এই সমস্ত ছবি দেখিয়া সেই গুহাবাসী মানুষদের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য খবর জানিতে পারিয়াছেন। এই মানুষদের গায়ে লম্বা লম্বা লোম হইত, তাহাদের চেহারা ছিল কতকটা এস্কিমোদের মতো, তাহারা চাষবাস জানিত না, বেদে জাতির মতো নানা স্থানে ঘুরিত আর দল বাঁধিয়া শিকার করিত। সম্ভবত ইহাদের অনেকেই কাঁচা মাংস খাইত এবং কেহ কেহ হয়ত মানুষ খাইতেও কোন আপত্তি বোধ করিত না। ইহার পর আরও বুদ্ধিমান একরকম মানুষ দেখা দিল যাহারা পাথর-কাটা বিদ্যায় রীতিমত কারিকর হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের অস্ত্রগুলি খুব সমান ও ধারাল এবং রীতিমত শান দিয়া পালিশ করা। তার উপর ইহারা মাটির বাসন গড়িতে, চাষবাস করিতে, কাপড় বুনিতে ও গরু ছাগল প্রভৃতি জন্তু পুষিতেও শিখিয়াছিল। ইহারা যেখানে যাইত সেইখানেই সেই প্রাচীন যুগের আনাড়ি মানুষকে তাড়াইয়া মারিয়া শেষ করিত। বলিতে গেলে, পাথরের যুগের এই নূতন মানুষটি হইতেই সভ্যতার ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে।



আগুন

আজকালকার সভ্য মানুষ, যাহারা দিব্য আরামে ঘরে বসিয়া দিয়াশলাই ঠুকিয়া আগুন জ্বালায়, তাহারা ভাবিয়াই দেখে না যে এই আগুন মানুষের কত তপস্যার ধন। যে-আগুন বনে জঙ্গলে দাবানল হইয়া জ্বলে, যে-আগুন আগ্নেয়পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় জিভ মেলিয়া ধুঁকিতে থাকে—সেই আগুনকে মানুষ যখন আপনার শক্তিতে জ্বালাইতে শিখিল, সেইদিন মানুষ এমন বিদ্যা শিখিল যাহা মানুষ ছাড়া আর কেহ জানে না। চক্‌মকি পাথর ঠুকিয়া বা কাঠে কাঠে ঘসিয়া সেই সে কোন্ কালের আদিম মানুষ আগুন জ্বালাইবার উপায় বাহির করিয়াছিল, আজও পৃথিবীর কত অসভ্য অসভ্য জাতি ঠিক সেই উপায়ে প্রতিদিন আগুন জ্বালিতেছে। এই কাজ করিতে কৌশল ও পরিশ্রম দুয়েরই দরকার হয়। কাঠের মধ্যে কাঠ ঘুরাইয়া আগুন জ্বালিবার প্রথা আমাদের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল—বেদে এবং পূরাণে তার কথা অনেক কথা অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকবার এইভাবে আগুন জ্বালান বড় সহজ কথা নয়, সেইজন্য একবার আগুন জ্বালান হইতে তাহাতে বার বার কাঠ-কুটা শুকনা পাতা ইত্যাদি দিয়া সেই আগুনকে বাঁচাইয়া রাখা দরকার হইত। কেবল আমাদের দেশে নয়, এইরকম আগুন রক্ষার আয়োজন রোম গ্রীস, ইজিপ্ট প্রভৃতি সকল দেশেই ছিল। অনেক সময়ে রীতিমত মন্দির গড়িয়া পুরোহিত রাখিয়া এই আগুনের তদ্বির করা হইত। লোকে সেই সকল মন্দির হইতে প্রতিদিন আগুন লইয়া আসিত এবং সকলে মিলিয়া আগুনের সম্মান ও পূজা করিত।

আগুন না থাকিলে মানুষের অবস্থা কি হইত? আগুন ছিল

তাই মানুষ শীতের মধ্যেও টিঁকিতে পারিয়াছে, কত হিংস্র জন্তুর হাত হইতে আপনাকে বাঁচাইতে পারিয়াছে, রান্না করিতে শিখিয়াছে, মাটি পোড়াইয়া বাসন গড়িতে শিখিয়াছে। সহরে গ্রামে ঘরের আশেপাশে সর্বদা যেসব জিনিস কাজে লাগে, তাহার দিকে চাহিয়া দেখ, আগুন না হইলে তাহার কোন্‌টা তৈয়ারি করা সম্ভব হইত? মাটির হাঁড়ি, কাঁসার বাসন, সোনা রূপার অলংকার এসব ত ছাড়িয়াই দিলাম। জুতাটি যে পায়ে দিয়াছ তাহার কাঁটাগুলি ত লোহার, ঐ জুতা সেলায়ের জন্য লোহার ছুঁচ দরকার হইয়াছিল ত? আগুন না থাকিলে তাহা সম্ভব হইত কিরূপে? ঘষে এত যে সাবান সুগন্ধি ওষুধপত্র ব্যবহার কর, তাহার মালমশলার জন্য কত কারখানার কত চুল্লি জ্বালিতে হয় তাহা একবার ভাবিয়া দেখ ত। রাত্রে যে আলো জ্বালাইয়া পড়াশুনা কর, সেই আলোটুকু যদি না থাকিত তবে কেমন অসুবিধা হইত বল দেখি। আর ঐ যে কাচের চশমা পর, কাচের 'থার্মমিটার' দিয়া জ্বর মাপ, আর অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণ প্রভৃতি অসংখ্য কাচের যন্ত্র ব্যবহার কর, ক্ষার চুণ ও বালি আগুনে না গলাইলে সে কাচ আসিত কোথা হইতে? আগুন ছাড়া পৃথিবী যদি কল্পনা করিতে চাও ত এই সমস্ত জিনিস বাদ দিতে হয়—এই সমস্ত জিনিসের সাহায্যে মানুষ জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতার যাহা কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছে সে সমস্ত লোপ করিতে হয়, আর মানুষকে কল্পনা করিতে হয় সেই আদিমকালের অসভ্যের মতো—যাহারা ফলমূল ও কাঁচা মাংস খাইয়া, গাছের ছাল বাকল ও জানোয়ারের চামড়া পরিয়া, গাছ পাথরের অস্ত্রে সাজিয়া, গাছে জঙ্গলে গুহা গহ্বরে লুকাইয়া ফিরিত। সে সময়ের পৃথিবীতেও কাঠ ছিল, কয়লা ছিল, আগুন জ্বালিবার মালমশলা সবই ছিল। ছিল না কেবল সেই জ্ঞানটুকু যাহাতে আগুন জ্বালিবার সংকেতটি জানা যায়। সেই মানুষ, আর এখনকার এই মানুষ! এ দুয়ের মধ্যে এত যে প্রকাণ্ড তফাৎ দেখিতেছ, তাহার প্রধান কারণ এই আগুনের আবিষ্কার।

আমাদের দেশে আগুনকে বলে 'সর্বভুক'। একবার যদি সে জিভ মেলিয়া বাহির হইল, তবে তাহার ক্ষুধার আর শেষ নাই—সে তখন সব খাইয়া উজাড় করিতে পারে। আগুনকে যদি তুষ্ট করিতে চাও, কাজে লাগাইতে চাও, তবে তাহার ক্ষুধা মিটাইবার খোরাক দেওয়া চাই। কাগজ দাও, খড় দাও, কাঠ দাও, কয়লা দাও, তেল ঘি কেরোসিন যাহা সে হজম করিতে পারে তাহাই দাও—একটা কোন খোরাক না জোগাইলে সে জ্বলিতে পারে না। আগুন জ্বালিবার জন্য মানুষে প্রতি বৎসর কত বন জঙ্গল উজাড় করে, মাটির ভিতরে ঢুকিয়া কত লক্ষ লক্ষ মণ কয়লা খুঁড়িয়া তোলে, কত বড় বড় ব্যবসা ফাঁদিয়া কেরোসিন প্রভৃতি খনির তেল দেশ-বিদেশে চালান দেয়, কত মোম চর্বি ঘি তেল খরচ করিয়া ঘরে ঘরে বাতি জ্বালায়, তাহার হিসাব লইতে গেলে অবাক হইতে হয়। আজকালকার নিতান্ত অসভ্য যে মানুষ—লঙ্কা দ্বীপের ভেদ্দা বা আফ্রিকার 'বুশম্যান', তাহারাও আগুনের ব্যবহার জানে। অতি প্রাচীনকালে আগুন-ছাড়া মানুষ যাহারা ছিল তাহারা সে আগুন-ওয়ালা মানুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়া টিঁকিতে পারিত না, এ কথা সহজেই বোঝা যায়। শীতের অত্যাচারে, শত্রুর অত্যাচারে, হিংস্র জন্তুর অত্যাচারে—নানারকম বিপদে আপদে আগুনের সাহায্য না পাইলে আজকালকার এই মানুষ আজ কোথায় থাকিত, কে জানে? হয়ত মানুষ জাতিটারই পৃথিবী হইতে লোপ পাইবার জোগাড় হইত।

হিংস্র জন্তু পোষ মানিলেও তাহার হিংস্রতা একেবারে দূর হয় না। সেইজন্য সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়, কখন তাহার হিংসা বুদ্ধি জাগিয়া উঠে। আগুনকে বাগ মানাইতে গিয়াও মানুষকে পদে পদেই এইরকম বিপদে পড়িতে হইয়াছে। আমরা একবার শিলং পাহাড়ে গিয়াছিলাম, সেখানে পাহাড়ের গায়ে লম্বা লম্বা দাগ দেখিয়া দূর হইতে ভাবিয়াছিলাম, ওগুলি বুঝি পাহাড়ে উঠিবার রাস্তা নয়, জঙ্গলের মাঝে মাঝে চওড়া ফিতার মতো ফাঁকা জমি, —ঠিক যেন পাহাড়ের মাথার উপর ক্ষুর চালাইয়া খালের মতো করিয়া চাঁচিয়া রাখিয়াছে। শুনিলাম,

আগুনের ভয়ে নাকি ওরকম করা হইয়াছে, কোথাও আগুন লাগিলে, ঐ ফাঁকা জায়গা পর্যন্ত আসিয়া আগুন আর ছড়াইতে পারে না। আমেরিকার বড় বড় প্রেয়ারি বা ঝোপজমিতে কেবল ঝোপজঙ্গল ছাড়া আর কিছু দেখা যায়না—সেখানে আগুন লাগিলে এক-এক সময়ে ব্যাপার ভারি মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। সে আগুন এমন হু হু করিয়া ছড়াইয়া পড়ে যে মানুষে অনেক সময়ে ঘোড়া ছুটাইয়াও তাহার হাত এড়াইয়া পলাইতে পারে না।

এসব ত গেল বাহিরের আগুনের কথা। মানুষের ঘরে ঘরে সংসারের কাজের জন্য প্রতিদিন যে আগুনের দরকার হয়, সেই আগুন যখন এক একবার ছাড়া পাইয়া ঘরবাড়ি সহর গ্রাম সব খাইয়া শেষ শেষ করে, তাহাও কি সাংঘাতিক। কখন কাহার অসাবধানতায় আগুন ছড়াইয়া সর্বনাশ উপস্থিত হয়, তাহার জন্য কতরকমে মানুষকে সতর্ক হইতে হয়। বড় বড় সহরে দমকলের ষ্টেশন থাকে, আগুন নিভাইবার জন্য কত লোকলস্কর ও কতরকম আয়োজন রাখিতে হয়। বড় বড় দমকল, যাহা হইতে জলের ফোয়ারা ছুটিয়া আগুনের মধ্যে গিয়া পড়ে, তিনতলা চারতলার সমান লম্বা লম্বা মই, যাহাকে দূরবীণের মতো গুটাইয়া রাখা যায়, আর বড় বড় মোটর বা ঘোড়ার গাড়ি যাহাতে আগুনের জায়গায় চটপট ছুটিয়া যাওয়া যায়, আর আগুন লাগিলে পর আগুনের আফিসে তাড়াতাড়ি খবর পৌছাইবার জন্য নানারকম ব্যবস্থা। টেলিফোনের আফিসে একটিবার ফায়ার! বলিয়া খবর দাও, অমনি মুহূর্তের মধ্যে আগুন ষ্টেশনের সাড়া শুনিবে—'কোথায় আগুন?' ব্যস! এক মিনিটের মধ্যে ঢং ঢং শব্দে দমকল ছুটিয়া বাহির হইবে। সে শব্দ শুনিলে রাস্তার গাড়ি ঘোড়া মোটর সাইকেল সব শশব্যস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দেয়। যাহারা আগুনের পল্টনে কাজ করে, তাহাদের শিক্ষা এবং সাহস দুই দরকার। ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহাদের বীরত্বের অনেক আশ্চর্য কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়।

বড় বড় আগুনের দৃশ্য একদিকে যেমন ভয়ানক, আর একদিকে তেমনি সুন্দর। আগুনে সহর বাড়ি পুড়াইয়া কত মানুষের সর্বনাশ করে, তাহাতে মানুষ হাহাকার করে, আবার সেই আগুনেরই প্রচণ্ড গম্ভীর তেজ দেখিয়া বিস্ময়ে মানুষ অবাক হইয়া থাকে। এম্‌ডেন নামে জার্মানদের একটা যুদ্ধ জাহাজ কয়েকদিন বঙ্গোপসাগরে ভারি উৎপাত করিয়াছিল। সেই জাহাজের একটা গোলা মান্দ্রাজের একটা প্রকাণ্ড কেরোসিনের চৌবাচ্চায় পড়িয়া সমুদ্রের ধারে যে অগ্নিকাণ্ড লাগাইয়াছিল 'তামাসা' হিসাবে সে দৃশ্য নাকি অতি চমৎকার হইয়াছিল! আর কেরোসিনের জন্ম যেখানে, সেখানে ব্যবসার জন্য খনি খুঁড়িয়া, কূয়া বসাইয়া, কেরোসিনের হ্রস্ব বিল ও আর বর্ণনা হয় না। পেটুক আগুন তখন মনের মতো খোরাক পাইয়া উল্লাসে লক্ষ লক্ষ মণ কেরোসিন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে থাকে তখন ব্যাপারটি যে কেমন হয়, তাহার আর বর্ণনা হয় না। পেটুক আগুন তখন মনের মতো খোরাক পাইয়া উল্লাসে লক্ষ লক্ষ জিভ মেলিয়া ধোঁয়ার মত হুঙ্কার ছাড়িয়া স্বর্গ মর্ত্য গ্রাস করিতে চায়। তাহার কাছে লঙ্কাকাণ্ডই বা কি আর খাণ্ডব দাহনই বা লাগে কোথায়।



ধূলার কথা

ঘরের দেয়াল মেঝে আসবাবপত্র যতই ঝাড়ি যতই মুছি, খানিকক্ষণ রাখিয়া দিলেই আবার দেখি, যেই ধূলা সেই ধূলা। এত ধূলা আসেই বা কোথা হইতে, আর এ ধূলার অর্থ ই বা কি ?

টেবিলের উপর হইতে খানিকটা ধূলা সংগ্রহ করিয়া অণুবীক্ষণ দিয়া দেখ—তাহার মধ্যে চুন, সুরকি, কয়লার গুঁড়া হইতে সূতার আঁশ, পোকার ডিম, ফুলের রেণু পর্যন্ত প্রায় সবই পাওয়া যাইতে পারে। আরও সূক্ষ্মভাবে দেখিতে পারিলে কত সাংঘাতিক রোগের বীজও তাহার মধ্যে দেখা যাইবে। জানালার ফাঁক দিয়া যে আলোর রেখা ঘরের মধ্যে আসে তাহার মধ্যেও চাহিয়া দেখ, ধূলা যেন কিল্‌বিল্‌ করিতেছে। এই ধূলার মধ্যেই আমরা বাস করি, চলিফিরি, নিশ্বাস লই। মানুষ যত দূর দেখিয়াছে, যত দূর খুঁজিয়াছে, ধূলার আর শেষ কোথাও নাই। আকাশে খুঁজিয়া দেখ ; যত দূর উঠিবে, তত দূর ধূলা—যেখানে মেঘ নাই কুয়াশা নাই, বাতাস যেখানে অসম্ভব রকম পাতলা সেখানেও ধূলার অভাব নাই। সে ধূলা যে কত সূক্ষ্ম তাহা চোখে মালুম হয় না, অণুবীক্ষণের হিসাব দিয়া বুঝিতে হয়। অথচ সে ধূলাও বড় সামান্য নয়—সেই ধূলাই সারাটি আকাশকে নীল রঙে রাঙাইয়া রাখে, সেই ধূলাই উদয়াস্তের সময় সূর্যকিরণকে শুষিয়া এমন আশ্চর্য জমকালো রঙের সৃষ্টি করে। আরও দূরে যাও, পৃথিবী ছাড়িয়া যেখানে আকাশের খোলা ময়দান পড়িয়া আছে সেখানে যাও ; দেখিবে, যে নিয়মে গ্রহ চন্দ্র সকলে আপন আপন পথে ঘুরিতেছে সেই একই নিয়মে অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণাও বড় বড় চক্র আঁকিয়া চলিতেছে। এই প্রকাণ্ড পৃথিবী যদি একটি ধূলিকণার মতোই হইত, তবুও সে এমনিভাবে

বছরের পর বছর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিত—কে তখন তাহার খবর রাখিত।

এই পৃথিবীর উপর ধূলার যে অদ্ভুত খেলা চলিয়াছে তাহাকে ধূলার খেলা বলিয়া জানে কয়জন? যখন কণায় কণায় বৃষ্টিজল জমিয়া বর্ষা-ধারা নামিতে থাকে, যখন কুয়াশার ঘনঘটায় চারিদিক ঢাকিয়া ফেলে তখন নিশ্চয় জানিও এ সমস্তই ধূলার কৃপায়। ধূলা না থাকিলে বাষ্পকণা জমিয়া জল হয় না, স্বচ্ছ আকাশে মেঘ কুয়াশার জন্ম হয় না।

সুতরাং ধূলা জিনিসটাকে আমরা যতই আমাদের জিনিস বলিয়া উড়াইয়া দেই না কেন উৎপাত মনে করিয়া তাহাকে যতই দূর করিতে চাই না কেন, আর তাহার পরিচয় লওয়াটা যতই অনাবশ্যক ভাবি না কেন, আসলে সে বড় একটা সামান্য জিনিস নয়। তোমরা হয়ত বলিবে, 'সামান্য না হউক, জিনিসটা বড় বিশ্রী ও নোংরা।' হাঁ, নোংরা বটে। যখন সে আমার সাফ কাপড় ময়লা করিয়া দেয়, আবার ঘরের মধ্যে যেখানে সেখানে জমিয়া থাকে, যেখানে তাহাকে দিয়া আমার কোন দরকার নাই সেইখানে আসিয়া পড়ে—তখন তাহাকে নোংরা বলি। কিন্তু 'ধূলা' বলিলেই যে একটা নোংরা বিশ্রী কিছু ভাবিতে হইবে, এরূপ মনে করা ঠিক নয়। প্রজাপতির পালক ঝাড়িলে যে ধূলা পড়ে তাহা চোখে দেখিতে অতি সূক্ষ্ম একটুখানি হালকা গুঁড়ার মতো দেখায়, দেখিলে কেহই তাহাকে ধূলা ছাড়া আর কিছুই বলিবে না। কিন্তু অণুবীক্ষণ দিয়া তাহাকে এমনই সুন্দর দেখায়! বাতাসে যে সব ধূলিকণা ভাসিয়া বেড়ায় তাহার মধ্যেও কত সময়ে কত আশ্চর্যরকমের কারিকুরি দেখা যায়।

গভীর সমুদ্রের তলা হইতে পাঁক ঘাটিয়া বা পচা পুকুরের উপরকার ময়লা ছাঁকিয়া যে জীবন্ত ধূলি বাহির হয় তাহার মতো সুন্দর জিনিস খুব অল্পই আছে। এগুলিকে উদ্ভিদ বলিতে পার, কিন্তু উদ্ভিদ বলিতে সাধারণত যেরকম জিনিস মনে করিয়া বসি, এগুলি একেবারেই সেরূপ

নয়। ইংরাজিতে ইহাদিগকে ডায়াটম বলে, আমরা এখানে তাহাকেই জীবন্ত ধুলি বলিতেছি। এই 'ডায়াটম' কথাটি, ইহার ০ অক্ষরটির মধ্যে যেটুকু ধরে তাহার চাইতেও কম পরিমাণ ধূলিকে অণুবীক্ষণের সাহায্যে ফটো তুলিয়া দেখিতে পার। তাহার চাইতেও ছোট 'ডায়াটম' অসংখ্য প্রকারের আছে। জলের উপর শেওলার মতো এই অদ্ভুত জিনিসগুলি কত সময়ে ভাসিতে থাকে। সাধারণ লোকে তাহাকে নোংরা ও বিশ্রী বলিয়া এড়াইয়া চলে, তাহার ভিতরে যে কি আশ্চর্য সূক্ষ্ম কাজ তাহারা সে সংবাদ রাখে না। কিন্তু যাঁহারা এ সকলের চর্চা করেন তাঁহারা যত্ন করিয়া এই ময়লা ঘাঁটিয়া এইসব উদ্ভিদ সংগ্রহ করেন ও তাহাদের চালচলন আকার-প্রকার লক্ষ করিয়া তাহাদের জীবন সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য কথা আমাদের শুনাইয়া থাকেন। ডায়াটমগুলিকে পোড়াইয়া সাফ করিলেও তাহার এই জীবকঙ্কাল সহজে নষ্ট হয় না, এগুলি এমনই মজবুত। ইহাদের আসল বাহার এই কঙ্কালগুলিতেই। জীবন্ত অবস্থায় এই কঙ্কালগুলি সবুজ কোষের মধ্যে ঢাকা থাকে। ইহাদের কারিকুরিগুলা তখন অণুবীক্ষণ দিয়াও চোখে পড়ে না।

এ পর্যন্ত অন্তত দশ হাজার রকমের ডায়াটম্ পাওয়া গিয়াছে। ছবিতে যত বড় করিবে তাহার গায়ে কারিকুরির মধ্যে ততই আরো আশ্চর্য সূক্ষ্ম কাজ দেখা যাইবে!

জীবন্ত অবস্থায় এই ডায়াটম্‌গুলির মধ্যে আরেকটি অদ্ভুত ব্যবস্থা দেখা যায় এই যে হাত পা কিছুই নাই, অথচ তাহারা চলিয়া বেড়ায় জলের মধ্যে এমন সুন্দর সহজভাবে তাহারা ঘুরিয়া চলে যে দেখিলে আশ্চর্য লাগে। কি করিয়া যে তাহারা চলে, তাহার কারণ ঠিক করিতে গিয়া বড় বড় পণ্ডিতদের অবধি মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে।



কাঠের কথা

কেউ কেউ হয়ত বলবে, "দূর ছাই! কাঠের কথা আবার শুনব কি? ভারি ত জিনিস, তাই নিয়ে আবার কথা!" তা বলতে পার কিন্তু কাঠ যে মানুষের কাজের পক্ষে কত বড় দরকারী জিনিস, তা একবার ভেবে দেখেছ কি? এখন না হয় সভ্য মানুষে কয়লা, কেরোসিন, গ্যাস বা ইলেকট্রিক চুল্লির ব্যবহার শিখেছে, কিন্তু তার আগেত ত জ্বালানি কাঠ না হলে মানুষের রান্নাবান্না কলকারখানা কিছুই চলত না, শীতের দেশে মানুষের বেঁচে থাকাই দায় হত। এই ত কিছুকাল আগেও কাঠের জাহাজ না হলে মানুষে সমুদ্রে যেতে পারত না, কাঠের কড়ি বরগা থাম না হলে তার ঘর বাড়ি তৈরি হত না।

বলতে পার, এখন ত এ সবের জন্য কাঠের ব্যবহার কমে আসছে। তা সত্যি। এমনকি, ঘরের দরজা জানালা আসবাবপত্র পর্যন্ত যে ক্রমে কাঠের বদলে অন্য জিনিস দিয়ে তৈরি হতে থাকবে তাতেও কোন সন্দেহ নাই। আর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই হয়ত দেখবে, ঘরে ঘরে নানারকম ঢালাই-করা মেটে পাথরের আসবাবপত্র! কিন্তু তবুও দেখা যায় যে খুব 'সভ্য' জাতিদের মধ্যেও কাঠের ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে চলেছে, কমবার লক্ষণ একটুও দেখা যায় না। প্রতি বৎসরে এত কোটি মণ কাঠ মানুষে খরচ করে এবং তার জন্য এত অসংখ্য গাছ কাটতে হয় যে অনেকে আশঙ্কা করেন, হয়ত বেহিসাবী যথেচ্ছ গাছ কাটতে কাটতে কোন্ দিন পৃথিবীতে কাঠের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হবে! এরকম যে সত্যি সত্যিই হতে পারে, তার প্রমাণ নানা দেশে পাওয়া গিয়েছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এক সময়ে এমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন ছিল আর তাতে এত অসংখ্য গাছ ছিল যে লোকে বলত এ দেশের কাঠ অফুরন্ত—

এরা সমস্ত পৃথিবীময় কাঠ চালান দিয়েও কোনদিন এত গাছ কেটে শেষ করতে পারবে না। কিন্তু সে দেশের লোকে এমন বে-আন্দাজ ভাবে এর মধ্যে বন জঙ্গল সব কেটে প্রায় উজাড় করে ফেলেছে যে এখন তারা নিজেরাই অন্য দেশ থেকে কাঠ আমদানী করতে বাধ্য হচ্ছে।

প্রতিদিন জাহাজ বোঝাই করা লক্ষ লক্ষ মণ কাঠ সাগর পার হয়ে নানা দেশ হতে নানা দেশে চলেছে। এত কাঠ লাগেই বা কিসে, আর আগেই বা কোথা থেকে? কানাডা রুশিয়া নরওয়ে ভারতবর্ষ অষ্ট্রেলিয়া, কত জায়গা থেকে কাঠ চলেছে ইউরোপ আমেরিকার বড় বড় বন্দরের দিকে। যেখানেই নূতন রেলের লাইন হচ্ছে সেখানেই মাটির নীচে খনি খোঁড়ার কাজ চলছে সেখানেই খনির দেয়ালে ছাদে ঠেকা দিবার জন্য বড় বড় কাঠের গুঁড়ি কাঠের থাম দরকার হচ্ছে। ইউরোপের বড় বড় সহরে রাস্তা বাঁধাবার জন্য কত অসংখ্য কাঠ ইটের মতো চৌকো করে কেটে বসান হচ্ছে।

কিন্তু কাঠকে কাজে লাগাবার জন্য আজকাল এর চাইতেও অনেক অদ্ভুত উপায় বের করা হয়েছে। কাঠ থেকে যে কাগজ তৈরি হয়, তা বোধহয় তোমরা সকলেই জান। যত খবরের কাগজ দেখ সে সমস্তই কাঠের কাগজে ছাপা। কেবল কাগজ তৈরির জন্যই প্রতি বৎসর প্রায় দশ কোটি মণ কাঠের দরকার হয়। কাঠওয়ালারা কাঠকে পিটিয়ে থেঁৎলিয়ে সিদ্ধ করে একটা অদ্ভুত জিনিস বানায়, তার নাম 'উডপাল্প'। বাংলায় 'কাঠের আমসত্ত' বললে বর্ণনাট্য নেহাৎ মন্দ হয় না। কাগজ-ওয়ালারা নানা দেশ থেকে এই অপরূপ আমসত্ত কিনে এনে তা দিয়ে কাগজ বানায়। আগে এইরকমে প্রক্রিয়ায় ধুয়ে এমন পরিস্কার এবং বিশুদ্ধ করা হচ্ছে যে তা থেকে খুব উঁচু দরের ভাল কাগজ পর্যন্ত তৈরি হতে পারে।

কাঠের মধ্যে প্রধান জিনিসটি হচ্ছে সেলুলোস্, কাঠকে বিশুদ্ধ করা মানে এই জিনিসটিকে খাঁটি অবস্থায় বের করা। পরিস্কার সাদা তুলো দেখেছ ত? সেই তুলোও সেলুলোস্ ছাড়া আর কিছুই নয়। তুমি

যে ধুতি পরে আছ সেও হচ্ছে সেলুলোসের ধুতি। আর এই যে সন্দেশ —তার সঙ্গে খানিকটা ভেজাল জিনিস মেশান আর তার উপরে কালির ছাপ। কাঠ থেকে যে সেলুলোস্ বেরোয় তাতে তুলোর মতো আঁশ থাকে না কিন্তু তা থেকে খুব সস্তায় অনেক আশ্চর্য জিনিস তৈরি হচ্ছে। সেলুসোস্‌কে রাসায়নিক উপায়ে বদলিয়ে একরকম আঠাল জিনিস তৈরি হয় তা থেকে টেনে সুতোর মতো সেলুলোসের আঁশ বার করা যায়। এই উপায়ে ইউরোপে প্রতি বৎসর ২০ লক্ষ মণ 'নকল রেশম' তৈরি হয়। তার চেহারা অনেক সময়ে আসল রেশমের চাইতেও সুন্দর হয়। এই 'রেশম' দেশ বিদেশে চালান দেওয়া হয়—আর কত সৌখিন লোকে সেই রেশমের পোষাক পরে বেড়ায়। তারা জানেও না তারা কাঠের পোশাক পরেছে।

এই সেলুলোস্ থেকে নাকি খুব সস্তায় খাঁটি 'স্পিরিট' অর্থাৎ অ্যাল্‌-কোহল বা সুরাসার প্রভৃতি অনেক জিনিস তৈরি হতে পারবে। তখন মানুষের কলকারখানা এঞ্জিন মোটর জাহাজ সব নাকি কাঠের স্পিরিট জ্বালিয়ে চালান হবে। অনেক হাজাররকম ওষুধপত্র আরক প্রভৃতি তৈরি করবার কাজে এই সুরাসার না হলে চলে না। রাসায়নিক কারখানায় এমন দরকারী জিনিস খুব কমই আছে। সুতরাং কাঠের কুচি আর করাতের গুঁড়ো থেকে যদি এমন জিনিসটাকে সস্তায় পাওয়া যায় তবে তাতে যে কতদিকে মানুষের কতরকম সুবিধা হবে সে আর বলে শেষ করা যায় না। শোনা যায়, শীঘ্র নাকি বাজারে কাঠের চিনি বেরোবার সম্ভাবনা আছে। নকল চিনি নয়, সত্যিকারের চিনি।

এতক্ষণ আমরা কাঠের গুণ ব্যাখ্যা করেছি, এখন ত জীবনচরিতের একটু পরিচয় নেওয়া যাক। পৃথিবীর নানা দেশে যত কাঠ আমদানী হয় তার মধ্যে কানাডার কাঠই সব চাইতে বেশী। সে দেশে শীতকালের গোড়াতেই গাছ কাটা আরম্ভ হয়। তারপর যখন বরফ পড়ে পথঘাট সব পিছল হয় তখন সেই পিছল পথের উপর দিয়ে গাছের গুঁড়িগুলোকে টেনে নিয়ে নদীর ধারে কিংবা

রেল লাইনে নিয়ে হাজির করে। যে বৎসর খুব তাড়াতাড়ি শীত পড়ে যায় কিংবা খুব অতিরিক্ত বরফ পড়ে, সে বৎসর তাদের ভারি কষ্ট। কাঠ নেবার বন্দোবস্ত এক এক জায়গায় এক-একরকম, পথ ঘাটের অবস্থা বুঝে কোথাও ঘোড়ায় টানা বা গরুতে টানা গাড়িতে করে কাঠ নেয়, কোথাও গাছের গুঁড়িগুলো ভারি ভারি মজবুত তক্তার উপর চাপিয়ে সেই তক্তা হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায়, কোথাও গুঁড়িগুলোকে একটার পর একটা মালার মতো সাজিয়ে বেঁধে, সেই কাঠের মালা টেনে নেওয়া হয়। সঙ্গে লোক থাকে, তারা কেবল দেখে যেন কোনটা কিছুতে আটকিয়ে না যায়। অনেক জায়গায় কাঠ নেবার জন্য রীতিমত রেলের লাইন পাতা হয়, আবার কোন কোন জায়গায় পিছল বরফের উপর বিনা লাইনেই এঞ্জিন চলে! সে এঞ্জিনের সামনে চাকা নাই, -'স্লেজ' গাড়ির মতো দুদিকে দুটো বাঁকান লোহার ধনুক-দণ্ড।

এমনি করে তারা জঙ্গলের গাছ কেটে এনে রেলের লাইন বা নদীর ধারে এসে হাজির হয়। তারপর গাছের গুঁড়িগুলোকে কারখানায় নিয়ে কেটে চিরে তক্তা বানিয়ে চালান দিতে হবে। নদীতে যদি বেশ স্রোত থাকে তাহলে এমন জায়গায় কারখানা বসান হয় যে, কাঠ-গুলোকে ভাসিয়ে দিলে তারা আপনা-আপনি গিয়ে কারখানায় হাজির হবে। সেখানে কারখানার লোকেরা তাদের ঠেকিয়ে বড় বড় লগি দিয়ে কারখানার ভিতরে নিয়ে পুরবে। কিন্তু সব জায়গায় সেরকম সুবিধামত নদী পাওয়া যায় না। হয়ত কোন নদীতে তেমন স্রোত নেই, কিংবা তাতে ওরকম কাঠ ছেড়ে দেবার হুকুম নেই, সেখানে মস্ত মস্ত কাঠের ভেলা বানিয়ে সেই ভেলাগুলোকে জাহাজে টেনে কারখানায় নিতে হয়।

স্রোতে কাঠ ভাসিয়ে দেওয়া যে সব সময়ে বড় সহজ কাজ, তা মনে কর না। অনেক সময়ে মাঝ পথে নদীর বাঁকে কাঠে কাঠ লেগে এমন জমাট বেঁধে যায় যে আবার রীতিমত হাঙ্গামা করে তাদের জট ছাড়িয়ে

না দিলে কাঠ আর চলতে পারে না। এ কাজে বিপদ খুবই, অনেক সময় হঠাৎ কাঠের জমাট খুলে গিয়ে এমন হুড়হুড় করে ভেসে আসে যে, তার সামনে পড়ে অনেক মানুষের প্রাণ যায়। কারখানায় এলে পর সেখানকার লোকেরা কাঠগুলোকে এক-এক করে কারখানার মুখের মধ্যে পুরে দেয়, আর সেখানে করাতকলে কাঠগুলো আপনা-আপনি কেটে চিরে তক্তা হয়ে বেরিয়ে আসে। একদিকে ক্রমাগত গাছের গুঁড়ি ঢুকছে, আর একদিকে ক্রমাগত কাটা তক্তা বেরিয়ে আসছে।



কয়লার কথা

আমি এক টুকরো কয়লা। রাস্তার ধারে পড়ে আছি, কেউ আমার খবর নেয় না। একটি ছোট্ট ছেলে তার মার সঙ্গে যেতে যেতে খপ্ করে আমায় কুড়িয়ে নিল। দেখে মা বললেন, 'আরে, ছি ছি— নোংরা! ওটা ফেলে দাও।' ছেলেটা অমনি আমার তাচ্ছিল্য করে ফেলে গেল। দেখে রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলতে লাগল। হায়রে। আমার যদি কথা কইবার শক্তি থাকত, একবার আচ্ছা করে শুনিয়ে দিতাম।

কি শোনাতাম? কেন, আমার বয়সের কথা, আমার বংশের কথা, আমার গুণের কথা। সে কথা এখন কি আর তোমরা বিশ্বাস করবে?

হাজার হাজার বছর আগে যখন তোমরা কেউ ছিলে না, তোমাদের মতো দু-পেয়ে জন্তুরা যখন পৃথিবীর উপর সর্দারী করতে শেখেনি, আমি তখন ছিলাম ভীষণ বড় জঙ্গলের প্রকাণ্ড গাছের মধ্যে। তোমরা যাকে বল 'বনস্পতি' আমি ছিলাম সেইরকম জাঁকাল গাছের জ্যান্ত ডাল। কত যুগের পর যুগ আমরা সেখানে ছায়া দিয়েছি, কত অদ্ভুত পাখি আমার উপর বসে বিশ্রাম করেছে, কত বিদ্ঘুটে জন্তু সেই গাছের আশেপাশে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু অমন যে বিরাট জঙ্গল সেও কি চিরকাল টিঁকতে পারে? এমন দিন এল, যখন আর সে জঙ্গলের চিহ্নমাত্র রইল না। যেখানে জঙ্গল ছিল সেখানে ছাই ভস্ম ধূলা বালির চাপের নীচে, ভিজা মাটি আর বৃষ্টির জলে মরা কাঠ পচতে লাগল। কত পথ-হারান নদীর স্রোত কত কাদামাটি জঞ্জাল এনে তার উপরে ফেলে গেল; কত ভূমিকম্পে কত আগুনে উৎপাতে সেই জমি কতবার ধসে

পড়ল, কতবার কেঁপে উঠল ; কত পাহাড়-গলা পাথর এসে কত নতুন জমি তৈরি হল, তার উপরে নতুন মাঠ, নতুন বন, নতুন প্রাণীর খেলা চলল। আমরা যুগ যুগ ধরে তারই তলায় পচতে পচতে চাপে আর গরমে পাথর হয়ে জমে উঠলাম। এমনি যে কত হাজার বছর ছিলাম, তার কি আর হিসাব রেখেছি? সেখানে মাটির নীচে কবরের মধ্যে বাইরের কোন খবর পৌঁছায় না—বাইরের কেউ তার খবর জানে না।

তারপর একদিন শুনলাম কিসের শব্দ, কে যে কি ঠুকছে। দিনের পর দিন রোজই ঠুকছে, খটাখট্ ঠকাঠক্ খটাং খটাং। ডাইনে বাঁয়ে চারিদিকে সেই একই শব্দ। শব্দ কাছে আসতে আসতে একদিন একেবারে আমারই সামনে এসে পড়ল, দেখলাম, তোমাদেরই মতো কতগুলো অদ্ভুত দু-পেয়ে জন্তু আমাদের সব ঠুকে ঠুকে কেটে নিচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম আমাদের কাজ বুঝি ফুরিয়েছে, এখন থেকে চিরটা কাল বুঝি এমনিভাবেই কাটতে হবে। কিন্তু দেখলাম, তা নয়। আমাদের নেবার জন্যই এরা খেটেখুটে রাস্তা কেটে নেমে এসেছে।

তারপর বাইরে এসে দেখলাম, পৃথিবী আর সে পৃথিবী নাই। সে সব গাছপালা নাই, সে সব জীবজন্তু নাই, যেদিকে তাকাই কেবল দেখি এই দু-পেয়ে জন্তুর আশ্চর্য সব কাণ্ডকারখানা। তুমি ছোক্‌রা, বড় যে আমায় তাচ্ছিল্য করে কথা কইছ, তুমি জান আমার খাতির কত? আমারই এই কালো রূপকে রাঙিয়ে নিয়ে তোমার ঘরের আগুন জ্বলে, আমার গুণেই রেল চলে, স্টিমার চলে, কলকারখানা সবই চলে। এই কলকাতার রাস্তায় গ্যাসের বাতি, বলি, এ গ্যাস আসে কোথা হতে কয়লা চুঁয়ে জ্বালানি গ্যাস হয়—আর হয় এমোনিয়া আর তেল-কয়লা, যাকে তোমরা বল কোল টার।

শুধু কি তাই? ঐ এমোনিয়া দিয়ে কত যে কাজ হয়, প্রতি বছর কত হাজার মণ গাছের সার তৈরি হয় তোমরা কি তার খবর রাখ? তারপর ঐ যে আলকাতরার মতো চট্‌চটে কালো নোংরা জিনিস,

যাকে তেল-কয়লা বললাম—তা থেকে রাসায়নিক পণ্ডিতেরা কত যে আশ্চর্য জিনিস বানিয়াছেন, তাদের নাম করতে গেলেও প্রকাণ্ড পুঁথি হয়ে যায়! কত আশ্চর্য সুন্দর রং, কাপড়ের রং, কালীর রং; কত নতুন নতুন সুগন্ধ, এসেন্সে ফুলের গন্ধ, সিরাপে ফলের গন্ধ; কত ডাক্তারি ওষুধপত্র—পোকা মারবার, রোগের বীজ মারবার কত অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র; কত নূতন নূতন যুদ্ধসামগ্রী, কত বোমার মশলা, কত বারুদের মশলা; আর ছোটবড় কত যে নকল জিনিস তার আর অন্তই নাই। এ সবই সম্ভব হচ্ছে কেবল আমার জন্যই, অথচ তোমরা ত আমায় খাতিরে করবে না—কারণ, আমি যে কয়লা, আমি যে নোংরা ময়লা কালো রাস্তার কয়লা।



লোহা

যে সমস্ত জিনিস মানুষে সর্বদা ব্যবহার করে, আজ যদি হঠাৎ তাহার কোনটির অভাব পড়িয়া যায়, তাহা হইলে ঠিক বোঝা যায়, কোন জিনিসটার যথার্থ মূল্য কতখানি। সোনা রূপা মণি মুক্তা সব যদি হঠাৎ একদিন পৃথিবী থেকে লোপ পায়, তবে অনেক সৌখিন লোকে হা-হুতাশ করিবে, মানুষের টাকা পয়সার কারবারের বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইবে, রূপার অভাবে ফটোগ্রাফের ব্যবসা প্রায় বন্ধ হইয়া আসিবে এবং ছোটখাট অনেকরকমের অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। কিন্তু তবু মানুষের জীবনযাত্রার কোন ব্যাঘাত হইবে না। বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা যেমন চলিতেছিল, অনেকটা সেই রকমই চলিতে থাকিবে। কিন্তু তেমনিভাবে যদি লোহার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তবে অবস্থাটা আরও মারাত্মক হইবে। মানুষের কলকারখানা রেল পুল জাহাজ প্রভৃতি, সভ্য দেশে যাহা কিছু না হইলে চলে না, তাহার সমস্তই বন্ধ হইয়া আসিবে। মানুষের যে কোন অস্ত্র বা যে কোন যন্ত্র বল, বড় বড় কামান, এঞ্জিন বা মোটর হইতে লাঙল কোদাল কাঁটা পেরেক পর্যন্ত, সবটাতেই লোহার দরকার হয়। যার মধ্যে লোহা নাই এমনও অসংখ্য জিনিস তৈয়ারি করিবার সময়ে লোহার যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। যে জিনিস তাহারও দরকার হয় না, যেমন অনেক ডাক্তারি ওষুধ, সেখানেও অনেক সময়েই কয়লার চুল্লি জ্বালিতে হয় এবং সেই কয়লা ভাঙিয়া উঠাইবার জন্য খনিতে লোহার কোদাল আর অনেক কলকব্জার দরকার হয়। মানুষের সকল রকম কাজে যে সমস্ত তৈজস বা বাসনপত্রের দরকার হয়, তাহার সমস্তই খনিজ জিনিসের তৈয়ারি। সেই সমস্ত জিনিস সংগ্রহ করিয়া তাহাকে কাজের উপযোগী

করিয়া গড়িতেও লোহার দরকার হয়। ঘরের দরজা জানালা, কড়ি বরগা, আসবাবপত্র, এ সমস্ত কাঠের তৈয়ারি হইতে পারে, কিন্তু সেই কাঠকে কাটিয়া চিরিয়া চাঁচিয়া ঘষিয়া দরকারমত গড়িয়া লইবার জন্য পদে পদেই লোহার কুড়াল করাত র‍্যাঁদা বাটালি প্রভৃতি যন্ত্রের দরকার হয়।

পৃথিবীতে এমন দেশ নাই যেখানে লোহা পাওয়া যায় না। পথে ঘাটে, মাটিতে জলেতে, খুঁজিতে গেলে সর্বত্রই লোহা পাওয়া যায়। অথচ এক সময়ে লোকে লোহার ব্যবহার জানিত না, লোহা তৈয়ারি করিতে পারিত না। জল লাগিলে লোহায় মরিচা ধরিয়া যায়; লোহা-ধাতু আর লোহার মরিচা, দুটা এক জিনিস নয়। কিন্তু মরিচা বা 'লৌহমল' নানারকমে 'শোধন' করিয়া তাহা হইতে আবার খাঁটি লোহা বাহির করা যায়। যে সমস্ত খনিজ জিনিস হইতে লোহা তৈয়ারি করা হয়, সেগুলিও এই রকম মরিচা-জাতীয় জিনিস, অনেক হাঙ্গামা করিয়া তাহাদের শোধন না করিলে তাহা হইতে লোহা বাহির হয় না। সোনা, রূপা ও তামা অনেক সময়ে খাঁটি ধাতুর আকারেও পাওয়া যায় এবং খনিজ অবস্থায় তাহাদের শোধনও লোহার চাইতে অনেক সহজ। সেই জন্য তামা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার শিখিবার পরেও মানু অনেক দিন পর্যন্ত লোহা বানাইবার কৌশল বাহির করিতে পারে নাই।

একবার যদি কোথাও কোন লোহা বানাইবার কারখানায় যাও, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে লোহার মতো সামান্য জিনিসের জন্যও মানুষকে কতখানি চিন্তা পরিশ্রম ও হাঙ্গামা করিতে হয়। আমাদের দেশে সাক্‌চিতে টাটা কোম্পানির লোহার কারখানা আছে—সেখানে প্রতি বৎসর হাজার হাজার মণ লোহা আর ইস্পাত তৈয়ারি হয়। প্রকাণ্ড চিমনির মতো বড় বড় পাথরের চুল্লি, তাহার মধ্যে সারাদিন সারারাত আগুনের আর বিশ্রাম নাই। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, রাবণের চিতার মতো সে আগুন জ্বলিতেই থাকে। একবার আগুন নিভিয়া গেলেই হাজার হাজার টাকার চুল্লি ফাটিয়া চৌচির

হইয়া যাইবে। তাই দিনরাত সেখানে কাজ চলিতেছে, চিমনির মুখ দিয়া আগুনের লাল জিভ সারাক্ষণ আকাশকে রাঙাইয়া তুলিতেছে। মাঝে মাঝে চুল্লির ঢাকনি খুলিয়া, গাড়ী বোঝাই কয়লা-মিশান লৌহ-খনিজের মশলা চুল্লির মধ্যে ঢালিয়া দেয়—একেবারে বিশ ত্রিশ বা একশ-দুশ মণ। চুল্লির মধ্যে সেই সমস্ত মশলা গলিয়া পুড়িয়া তরল লোহা হইয়া জমিতে থাকে। মাঝে মাঝে চুল্লির নর্দমা দিয়া লোহার ময়লা 'গাদ' বাহির করিয়া দিতে হয়। দরকারমত শোধন হইলে পর পাশের একটা নল খুলিয়া তরল লোহা ঢালিয়া ফেলিতে হয়।

পৃথিবীতে যত লোহার কারখানা আছে, তাহাতে প্রতি বৎসর তিনশ কোটি মণ লোহা তৈয়ার হয়। এবং বছর বছর ইহার পরিমাণ বাড়িয়াই চলিয়াছে। লোহা নানারকমের হয়। যে লোহা ঢালাই করিয়া সাধারণত কড়ি বরগা শিক প্রভৃতি তৈয়ারি হয় আর যে ইস্পাত লোহা ক্ষুর বা তলোয়ারের জন্য ব্যবহার হয়, এ দুয়ের মধ্যে অনেকখানি তফাৎ। সাধারণ চুল্লির মধ্যে যে লোহা তৈয়ারি হয়, তাহা একেবারে খাঁটি লোহা নয়। আমরা যত রকম লোহা ব্যবহার করি, তাহার কোনটাকেই ঠিক খাঁটি লোহা বলা যায় না। এইসব লোহার সঙ্গে অল্প বা বেশি পরিমাণে অঙ্গার বা কয়লা, গন্ধক, ফস্‌ফরাস প্রভৃতি নানারকম জিনিসের মিশাল থাকে এবং সেই মিশালের জন্য লোহার রূপ গুণ নানারকম হইয়া যায়। কোনটা নরম, কোনটা শক্ত, কোনটা সহজে ঢালাই হয়, কোনটা বেশ দলিয়া পিটিয়া নানারকম করা যায়, কোনটা স্প্রিং-এর মতো বাঁকান যায়, কোনটা বাঁকাইতে গেলে ভাঙিয়া যায়, কোনটাকে নানারকম তাতাইয়া এবং নানা কৌশলে ঠাণ্ডা করিয়া ইচ্ছামত মজবুত করা যায়, কোনটাকে চমৎকার শান দেওয়া বা পালিশ করা যায়।

এক একরকম কাজের জন্য এক একরকম লোহা। আজকাল ভাল ইস্পাত ও উঁচুদরের লোহা করিতে হইলে আগে খাঁটি কাঁচা লোহা তৈয়ারি করা হয়। তারপর তাহার সঙ্গে ঠিক দরকারমত অন্য কোন

ধাতু বা কয়লা প্রভৃতি মিশাইয়া আবার সমস্তটা গলাইয়া একসঙ্গে জ্বাল দিয়া লইতে হয়। প্রথম কাজটির জন্য বশেষ রকম চুল্লির দরকার হয়, তাহার গঠন এবং ভিতরকার বন্দোবস্ত সাধারণ চুল্লির মতো নয়। একটা প্রকাণ্ড পিপার মতো জিনিস, তাহার মধ্যে পাঁচশ বা হাজার মণ মশলা ধরে; সেই পিপার তলার দিকে আগুন জ্বালাইয়া, তাহার ভিতর দিয়া ঝড়ের মতো দমকা বাতাস চালাইয়া দেওয়া হয়। বাতাসের ঝাপটায় আগুনের শিখা প্রকাণ্ড জিভ মেলিয়া পিপার মুখ হইতে ছুটিয়া বাহির হয়। লোহার মশলা আগুনের তেজে গলিয়া পুড়িয়া যতই বিশুদ্ধ হইয়া আসিতে থাকে, আগুনের রংও সেই সঙ্গে বদলাইয়া আসিতে থাকে। প্রথমে বেগুনি, তারপর ক্রমে লাল হলদে সাদা হইয়া, শেষে যখন ঘোর নীল রং দেখা দেয় তখন আগুনের তেজ নিভাইয়া, প্রকাণ্ড পিপাটিকে কলে ঘুরাইয়া কাৎ করিয়া, তাহার ভিতর হইতে তরল কাঁচা লোহা ঢালিয়া ফেলা হয়। তারপর ওজনমত নানা কাজের উপযুক্ত করিতে হয়।

এখানেও কি হাঙ্গামার শেষ আছে? সেই লোহাকে আরও কতবার অগ্নি পরীক্ষায় ফেলিয়া, কত দূরমুষ কলে সাংঘাতিকভাবে দলিয়া পিষিয়া, কতরকমের উৎপাত সহাইয়া তবে তাহাকে ভারি ভারি কঠিন কাতে লাগান চলে।



কাগজ

এমন সময় ছিল মানুষ লিখিতে শিখিয়াছে, কিন্তু কাগজ বানাইতে শিখে নাই। কোন কোন দেশে তখন পাথরে খোদাই করিয়া লিখিবার রীতি ছিল। কেহবা নরম মাটিতে লিখিয়া সেই মাটি পরে পোড়াইয়া ইটের টালি বানাইয়া লইত। সেই ইটেতেই তাদের কাগজের টান চলিয়া যাইত। কিন্তু এইরূপ ইটের টালি নিয়া লেখাপড়া করা যে বিশেষ অসুবিধার কথা তাহা সহজেই বুঝিতে পার। মনে কর কোন ছাত্র পাঠশালায় যাইতেছে। অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিন ঝুড়ি ইটের পুঁথি চলিল—আর লিখিবার জন্য এক তাল কাদা। সামান্য কয়েকখানা চিঠি পাঠাইতে হইলেই প্রাণান্ত পরিশ্রম—মাটি আনরে, জল আনবে, ঠাসিয়া কাদা করবে, চৌকস করবে, টালি বানাওরে, তবে তাহাতে অক্ষর লেখরে, পোড়াওরে, ঠাণ্ডা কররে, মুটে ডাকরে—হাঙ্গামের অন্ত নাই।

ইহার চাইতে আমাদের দেশে যে গাছের পাতায় লেখার রীতি অনেকদিন চলিয়া আসিয়াছে সেটা অনেক সহজ এবং সুবিধাজনক। ৬০০০ বছর আগে ইজিপ্টে 'পেপিরাস' গাছের কচি ছাল পিটিয়া থ্যাৎলাইয়া কাগজের মতো একরকম জিনিস তৈয়ার করিত। এই পেপিরাস কথা হইতেই ইংরাজী পেপার (পেপার) শব্দটা আসিয়াছে। কিন্তু এই পেপিরাস জিনিসটাকেও ঠিক কাগজ বলা যায় না। কাগজ তৈয়ারির উপায় প্রথম বাহির হইয়াছিল চীনদেশে, কিন্তু চীনারা এই বিদ্যা আর কাহাকেও শিখাইত না। প্রায় বার শত বৎসর হইল কতকগুলি চীনা কারিগর আরবীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে ধরা পড়ে। তাহাদের কাছে আরবের কারিকরেরা কাগজ বানাইতে শিখিয়া লইল, এবং সেই

সময় হইতেই এই বিদ্যা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। আরব হইতে ইজিপ্ট, ইজিপ্ট হইতে আফ্রিকার অন্যান্য যায়গায় হয়।

তারপর স্পেন, জার্মানি, ইংলণ্ডে সকল জায়গায়ই ক্রমে ক্রমে কাগজের কারখানা দেখা দিল। সে সময়ে ছেঁড়া নেকড়া দিয়া সমস্ত কাগজ তৈয়ারি হইত এবং সেটা আগাগোড়াই হাতে হইত। পরিস্কার নেকড়াকে ভিজাইয়া একটা দাঁতাল জিনিস দিয়া ঠেঙান হইত, তাহাতে নেকড়াটা ছিঁড়িয়া সূতার আঁশের মতো টুকরা টুকরা হইয়া যাইত। তাহাতে জল মিশাইয়া আরও অনেকক্ষণ পিটিলে কতকটা পাতলা মণ্ডের মতো একটা জিনিস হয়। এই নেকড়ার মণ্ডকে চালানিতে চালিয়া নানারমমে ছাঁকিয়া ঝাঁকাইয়া লুচির মতো বেলিয়া তবে কাগজ তৈয়ারি হইত। সে সময়ে লোক কাগজটাকে খুব একটা সৌখীন জিনিস বলিয়াই মনে করিত, কিন্তু ক্রমে কাগজের দাম কমিয়া আসিল কাগজ বানাইবার নানারকম কল বাহির হইল আর কাগজের কাটতি বাড়িয়া গেল যে কাগজওয়ালারা দেখিল এত ছেঁড়া নেকড়াই জোগাড় করা সম্ভব নয়। তখন চারিদিকে খোঁজ পড়িয়া গেল, আর কি জিনিস হইতে কাগজ করা যাইতে পারে। প্রথমত স্পেন দেশের এস্পার্টো ঘাসে খুব কাগজ হইত, তারপর ক্রমে দেখা গেল তাহাতেও কুলায় না। সেই হইতে কাগজ বানাইবার জন্য কত জিনিস লইয়া যে পরীক্ষা হইয়াছে তাহা বলা যায় না। আখের ছিব্ড়া, কলার খোসা, পাট, খড়, ঘাস, বাঁশ, কাঠ—সূতার মতো আঁশওয়ালা, আখের মতো ছিবড়াওয়ালা কতরকম জিনিস আছে তার কোনটিই বাকী নাই। মোটের উপর বলা যাইতে পারে কাঠ, এস্পার্টো ঘাস আর পুরাতন নেকড়া ও কাগজ হইতেই আজকাল কাগজ প্রস্তুত হয়।

বোলতা যে চাক বানায় তাহার মধ্যে একটা জিনিস থাকে সেটা ঠিক কাগজের মতো। বোলতারা গাছের শাঁস খায় এবং সেই শাঁসকে চিবাইয়া হজম করিয়া এই কাগজ বাহির করে। আজকাল কাগজের কলেও সেইরূপে কাঠ ঘাস প্রভৃতি জিনিস হইতে নানারকম কাগজ

তৈয়ারি হয়। অবশ্য কাগজওয়ালাদের ঐসব জিনিস বোলতার মতো চিবাইতে হয় না, এ সব কাজই কলে হয়।

যে কাঠ হইতে কাগজ প্রস্তুত হয় সেই কাঠ আসে আমেরিকা ও নরওয়ের জঙ্গল হইতে। জঙ্গলওয়ালারা বড় বড় গাছের গুঁড়ি কাটিয়া কলের মুখে ফেলিয়া দেয়—আর কলের আর এক মাথায় কাঠ কুচি হইয়া বাহির হয়। সেই কুচিকে গুঁড়াইয়া, সিদ্ধ করিয়া পরিস্কার করিতে হয়, তারপর সেই ক্ষীরের মতো নরম কাঠকে চাপ দিয়া পাতলা পাতলা পাটালি বানান হয়—এবং সেই পাটালি কাগজওয়ালাদের কাছে চালান দেওয়া হয়।

কাগজওয়ালারা এই পাটালিকে আবার জলে ঘুঁটিয়া মণ্ড তৈয়ারি করেন, সেই মণ্ডকে সিদ্ধ করিয়া ঝোলের মতো করেন। এই ঝোল লোহার নলে করিয়া কাগজের কলের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয়। কল একদিকে কাঠ, ঘাস বা নেকড়ার ঝোল খাইতে থাকে আর একদিকে ৪/৫ মাইল লম্বা কাগজের থান বাহির করিতে থাকে। সমস্ত দিন রাত কল চলিলে বারো হাত চওড়া আড়াই মাইল লম্বা একখানা কাগজের থান বাহির হয়। তাহার পরে গরম জলের চৌবাচ্চার মধ্যে সেই মণ্ড গুলিয়া ঝোল তৈয়ারি হয়।

ঝোলটা যখন কলের মধ্যে চালান হয় তখন সেটা একটা লম্বা চলন্ত ছাঁক্‌নির উপর পড়ে। ছাঁকনিটা চলিতে থাকে আর মাঝে মাঝে কেমন ঝাঁকানি দেয়, তাহাতে জল ঝরিয়া যায় এবং ঝোল ক্রমে চাপ বাঁধিয়া আসে। এমনিভাবে চলিতে চলিতে ঝোলটা কলের আরেক মাথায় আসিয়া পড়ে—সেখানে লুচি বেলিবার বেলুনের মতো অনেকগুলো 'রোলার' খাটান থাকে। ছাঁক্‌নিটা এইখানে আসিয়া ঝোলটাকে একটা রোলারের গায়ে ছিটকাইয়া দেয়। কিন্তু সে ঝোল আর এখন ঝোল নাই, এখন তাহার চেহারা অনেকটা ভিজা ব্লটিং কাগজের মতো। এতক্ষণে তাহাকে ঠিক কাগজ বলা চলে।

রোলারের গায়ে কাগজ লাগিবামাত্র রোলার তাহাকে টানিতে

থাকে। তারপর সেই টানে কাগজও অনেকগুলি রোলারের মধ্যে ঘুরপাক খাইতে থাকে। এমনি করিয়া কাগজকে ক্রমাগত চাপ দিতে হয়, লুচির মতো বেলিতে হয়, ঘষিতে ও পালিশ করিতে হয়, তাহাতেই কাগজ ক্রমে পাতলা ও মোলায়েম হইয়া আসে।

অবশ্য এই সমস্ত কাজই কলে আপনা-আপনি হইতে থাকে। দু-একজন লোক থাকে তারা কেবল দেখে সমস্ত কল ঠিকমত চলিতেছে কিনা। চব্বিশ ঘণ্টা সমান হিসাবে কাজ চলে, কলের এক মাথায় অনবরত ঝোল আসিয়া পড়িতেছে—সেই ঝোল শুদ্ধ ছাঁকনি কেবলই ছুটিতেছে, ছাঁক্‌নি হইতে জমাটবাঁধা কাগজ ক্রমাগতই রোলারের উপর লাফাইয়া পড়িতেছে, রোলারেরও বিশ্রাম নাই, সেও কাগজ টানিতেছে আর ঠেলিয়া বাহির করিতেছে।



কাঁচ

এক ছিল সওদাগর। সে গেল বাণিজ্য করতে। প্যালেষ্টাইনের তীরের কাছে নদীর মুখে তার ছোট্ট জাহাজটি বেঁধে সে তাঁর লোকজন নিয়ে ডাঙায় নামল, আর সেখানেই বালির উপর আগুন জেলে রান্না করতে বসল। হাঁড়ি বসাবার জন্য পাথর পাওয়া গেল না, কাজেই তাদের সঙ্গে যে সোডা-ক্ষারের পাটালি ছিল (যে সোডা দিয়ে বাসন সাফ করে) তারই কয়েকটার উপর তারা হাঁড়ি চড়াল। রান্না খাওয়া সব যখন শেষ হয়েছে, তখন তাদের সোডা-পাথরের চাক্তিগুলো তুলতে গিয়ে দেখলে তার চিহ্নমাত্র নেই, আছে কেবল স্বচ্ছ পাথরের মতন কি একটা জিনিস যা তারা কখন চোখে দেখেনি। এমনি করে নাকি কাঁচের আবিষ্কার হয়েছিল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত বালির সঙ্গে ক্ষার গলিয়ে লোকে কাঁচ তৈরি করে আসছে।

কলার 'বাসনা' পুড়িয়ে যে ছাই হয়, তার মধ্যে ক্ষার থাকে, তাকে বলে পটাশক্ষার! সোডা পটাশ চূন এই সমস্তই নানারকমের ক্ষার। চুল্লির আঁচে শুধু বালি কখনও গলে না; কিন্তু তার সঙ্গে চূন-পাথর আর ক্ষার মিশিয়ে জাল দিলে সব গলে এক হয়ে যায়, আর ঠাণ্ডা হলে কাঁচ হয়ে জমে থাকে।

প্রথম প্রথম মানুষে যে কাঁচ ব্যবহার করত, সে কেবল সৌখিন জিনিস হিসাবে। কাঁচ তৈরি করবার সময় তার সঙ্গে নানারকম ধাতুর মশলা মিশিয়ে তাতে নানারকম রং ফলান যায়। সেই সমস্ত রঙিন কাঁচের পুঁথিমুক্তো এক সময়ে লোকে অসম্ভব দামে কিনে নিত। বহু-মূল্য রত্ন বলে দেশ বিদেশে তার আদর হত। সে সময়ে কাঁচ তৈরীর সংকেত খুব অল্প লোকেই জানত, আর তারা কাউকে সে সব শেখাত

না। কিন্তু তবু দু'শ পাঁচশ বা হাজার বছরে সে সব গোপন কথাও অল্পে অল্পে ফাঁস হয়ে যেতে লাগল। ক্রমে এশিয়া থেকে ইউরোপের নানা স্থানে এ বিদ্যার চলন হতে লাগল। বুদ্ধিমান রোমানেরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কাঁচ তৈরিতে এমন উন্নতি করে ফেলল যে, কয়েক শ বছরের মধ্যেই কাঁচের সারসি, বাসন, প্রদীন-দান প্রভৃতি মানুষের— অন্তত ধনী লোকদের, নিত্য ব্যবহারের জিনিস হয়ে দাঁড়াল।

এখন আমরা যে সমস্ত ঝকঝকে পরিষ্কার কাঁচ সদা সর্বদা ব্যবহার করি, তিনশ বছর আগে সে রকম কাঁচ তৈরিই হত না। সে সময়কার কাঁচ হত ময়লাগোছের, তার মাঝে মাঝে ঘোলাটে দাগ থাকত। তার উপরেই রং ফলিয়ে, কৌশলে তার দাগের সঙ্গে দাগ মিলিয়ে ওস্তাদ কারিকরেরা আশ্চর্য সুন্দর সব জিনিস গড়ত। কিন্তু নিখুঁৎ সাদা কাঁচ যে কাকে বলে, সে তারা জানতই না। প্রায় তিনশ বছর আগে ইংলণ্ডের কয়েকজন উৎসাহী লোকের চেষ্টায় এক রকম চমৎকার কাঁচ তৈরি হয়, সেই থেকেই কাঁচের ব্যবসার চূড়ান্ত উন্নতির আরম্ভ। তার আগে কাঠের চুল্লিতে কাঁচ তৈরি হয়, এই ইংরাজেরাই সকলের আগে কয়লার চুল্লি ব্যবহার করলেন। এঁরা সমুদ্রের পানা পুড়িয়ে তা থেকে পটাশ বার করে, সেই পটাশের মধ্যে খাঁটি চক্‌মকি পাথরের গুঁড়ো আর সীসা-ভস্ম মিশিয়ে জলের মতো স্বচ্ছ নূতন রকমের কাঁচ তৈরি করলেন। তখন হতে সেই কাঁচের সারসি, সেই কাঁচের যন্ত্র বাসন চশমা দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সৌখিন ধনীর সখের কাঁচ সাধারণ লোকের ঘরাও জিনিস হয়ে উঠল।

লোহা না থাকলে মানুষের সভ্যতার শক্তি যেমন খোঁড়া হয়ে যায়, কাঁচ না থাকলেও বিজ্ঞানের বুদ্ধিও সেই রকম কানা হয়ে পড়ে। এই তিনশ বছরের মানুষ তার জ্ঞানের পথে যা কিছু উন্নতি ও আবিষ্কার করেছে, কাঁচ না থাকলে তার প্রায় বারো আনাই অসম্ভব হত। কাঁচ ছিল তাই দূরবীণ হতে পেরেছে, কাঁচ ছিল তাই অণুবীক্ষণের জন্ম হয়েছে। আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের আশ্চর্য রহস্য, গাছপালা কীট-

পতঙ্গের গঠন কৌশল, অসংখ্য রোগবীজের সঙ্গে স্বাস্থ্যের নিত্য লড়াই, অতি বড় ব্রহ্মাণ্ডের তত্ব আর অতি সূক্ষ্ম অণুপরমাণুর ইতিহাস, এ সমস্তই মানুষ জানতে পারছে কেবল কাঁচের কৃপায়। গ্রহ নক্ষত্রের আলোক দেখে পণ্ডিতে তার মালমশলার বিচার করেন, তার ভূত-ভবিষ্যৎ কত কি বলেন, তার জন্যও কাঁচের বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র চাই। ফটোগ্রাফার ছবি তোলেন, তার জন্য কাঁচের লেন্স চাই। বৈজ্ঞানিকের ঘরে ঘরে কাঁচের থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার, আরো নানা রকম কত যন্ত্র আর কত 'মিটার।' মোট কথা, কাঁচের ব্যবহার যদি মানুষে না জানত তবে আজও তার সভ্যতার ইতিহাস অন্তত তিনশ বছর পেছিয়ে থাকত।

নানা রকম কাজের জন্য নানা রকম কাঁচ তৈরি হয়। তা থেকে কাজের জিনিস গড়বার উপায়ও নানা রকম। সামান্য একটা গেলাস বোতল চিমনি বা কাঁচের নল বানাবার জন্য কত যে কায়দা কৌশলের দরকার হয়, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। একটি কারিকর একটা লোহার নলে করে খানিকটা গলা কাঁচ নিয়ে, তার মধ্যে ফুঁ দিয়ে, তাকে নেড়ে ঝেড়ে দুলিয়ে ঝুলিয়ে চটপট কত যে আশ্চর্য জিনিস গড়তে পারে, সে একটা দেখবার মতো ব্যাপার। নলের মুখটা চুল্লিতে-চড়ান তরল কাঁচের মধ্যে ডুবিয়ে তুললে নলের আগায় খানিকটা গলা কাঁচ উঠে আসে। তখন সেই নলের মধ্যে ফুঁ দিলে কাঁচটা গোল বুদ্বুদের মতো ফাঁপা হয়ে ফুলে ওঠে। নরম থাকতে থাকতে সেই বুদ্বুদটাকে লোহার টেবিলের উপর ইচ্ছামত চাপ দিয়ে চ্যাপ্টা করা যায়, অথবা গড়িয়ে ডিমের মতন বা হুঁকোর মালার মতন লম্বাটে করে দেওয়া যায়। কোন জিনিস গড়তে গড়তে, তার খানিকটা জায়গা আগুনে তাতিয়ে আবার যদি ফুঁ দেওয়া যায় তাহলে সেই তাতান জায়গাটুকু গম্বুজের মতো ফুলে উঠতে থাকে। কিংবা যদি সেটাকে নরম অবস্থায় ঝুলিয়ে ধরে আস্তে আস্তে ঘোল-মউনির নতন পাক দেওয়া যায়, তাহলে যেখানটা নরম সেটা চিমনির ডাঁটা বা নলের মতন লম্বা হয়ে ঝুলে

পড়ে। গোল জিনিসের গোড়ায় একটু নল বানিয়ে, তারপর আগার দিকটা গরম করে ফুঁয়ের জোরে ফাটিয়ে দিলে খাসা একটা বোতলের মুখ বা কলকে তৈরি হয়। এই সমস্ত নানা রকম জিনিষের গায়ে আবার খানিক নরন কাঁচ লাগিয়ে ইচ্ছামত হাতল বা পায়া গড়ে দেওয়া যায়। এ সব শিখতে যা সময় লাগছে, গড়তে গেলে ওস্তাদ লোকের তার চাইতেও কম সময় লাগে।

এই রকম অনেক জিনিসই আজকাল কলে তৈরি হয়। তার কতক গড়ে ঢালাই করে, কতক বানায় কল দিয়ে বাতাস ফুঁকে, আবার কতকগুলো তৈরি হয় নরম কাঁচের উপর অস্ত্র চালিয়ে। সাধারণ সরাসরি কাঁচ সমস্তই আগে অনেক হাঙ্গাম করে হাতে গড়ে তৈরি হত। এখনও প্রতিদিন হাজার হাজার সারসি সেই রকমে তৈরি হয়। তার জন্য প্রথমে ঘাড়-কাটা বোতলের মতো মস্ত মস্ত চোঙা বানিরে তারপর সেইগুলোকে কেটে চিরে, নরম করে, চেপ্‌টিয়ে ছোট বড় সারসি তৈরি হয়। কিন্তু খুব বড় বড় আরসি আর ভারি ভারি আসবাবি আয়নাগুলি প্রায় সমস্তই হয় ঢালাই করে। চুল্লির তরল কাঁচ গানলার মতো প্রকাণ্ড হাতায় করে তুলে একটা মস্ত টেবিলের উপর ঢেলে দিতে হয়। তারপর প্রকাণ্ড 'রোলার' দিয়ে সেই গরম কাঁচকে ক্রমাগত বেলে এবং দলে, শেষে পালিশ-কলে ঘষে সমান করতে হয়।

সব চাইতে ভাল আর দামী যে কাঁচ সেগুলো দরকার হয় বিজ্ঞানের কাজে তা দিয়ে দূরবীণ হয়, ফটো তুলবার 'লেন্স' হয়, হাজার রকম যন্ত্র তৈরি হয়। এই সব কাজের জন্য যে কাঁচ লাগে, সে কাঁচ একেবারে নিখুঁৎ হওয়া দরকার। তার আগাগোড়া সমান স্বচ্ছ হওয়া চাই। জলের মধ্যে নুন ফেললে সে নুন যেমন গলে গিয়ে সমস্তটা জলের মধ্যে সমান ভাবে ছড়িয়ে থাকে, ঠিক তেমনি করে কাঁচের সমস্ত মশলাগুলি সব জায়গায় ঠিক সমান ভাবে সমান ওজনে মিশে যাওয়া চাই। তা যদি না হয়, কাঁচের মধ্যে কোথাও যদি অতি সামান্য একটুখানিও দাগী বা ঘোলা থেকে যায়, তাহলেই আর তা দিয়ে কোন সূক্ষ্ম কাজ চলতে

পারবে না। সুতরাং এই কাঁচ তৈরি করবার সময় খুব সাবধান হতে হয়। কয়লা বা গ্যাসের চুল্লির উপর পাথুরে মাটির বাসনের মধ্যে অল্প আঁচে একটু একটু করে কাঁচের মশলা জ্বাল দিতে হয়। দশ বারো ঘণ্টা জ্বাল দেবার পর, চুল্লির আঁচ বাড়িয়ে দিয়ে খুব কড়া আঁচের তাপে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা রাখতে হয়। তারপর 'এসবেষ্টস' বা রেশমী পাথরের পোশাক-পরা মজুরেরা পাথরের ডাণ্ডা দিয়ে সেই তরল গরম কাঁচটাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রমাগত ঘুঁটতে থাকে। একে আগুনের মতো গরম, তার উপর এই ভীষণ পরিশ্রম, এক মিনিট থাকবার যো নেই। মজুরের পর মজুর আসে, তারা থেমে হাঁপিয়ে হয়রান হয়ে পড়ে, তাদের ঘাড়ে পিঠে ব্যথা হয়ে যায়, আবার তাদের জায়গায় নূতন মজুর আসে। ক্রমে চুল্লির আগুনও আস্তে আস্তে কমে আসতে থাকে, কাঁচটাও অল্পে অল্পে ঠাণ্ডা হয়ে জমে আসতে থাকে। এই সময়ে খুব সাবধান হওয়া দরকার। তাড়াতাড়ি জুড়িয়ে গেলে সবটা কাঁচ ঠিক সমান ভাবে জমতে পারে না, এলোমেলোভাবে জমাট বেঁধে কাঁচের মধ্যে নানারকম 'টান' ধরে যায়, সে দোষ চোখে দেখা না গেলেও কাজের সময় ধরা পড়ে। সাধারণ কাঁচের জিনিসও তৈরি করার সময়ে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করে ফেললে ঠুনকো হয়ে যায়, নাড়তে-চাড়তে সহজেই ভেঙে যায়। তাই কাঁচ যখন জমে আসতে থাকে তখনই চুল্লির চারদিকে ইটের দেওয়াল দিয়ে সব বুজিয়ে দিতে হয়। তার মধ্যে চুল্লির আগুন আস্তে আস্তে নিভে যায়। কাঁচটাও পাঁচ দিন দশ দিন বা পনেরো দিন ধরে অল্পে অল্পে জমাট বেঁধে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। তারপর দেওয়াল ভেঙে পাথুরে বাসন ভেঙে ভিতরকার কাঁচ বার করে আনে। সে কাঁচ যদি আস্ত থাকে তাহলে কাঁচওয়ালা খুব ভাগ্য বলতে হবে। প্রায়ই সেগুলো আট দশ টুকরো হয়ে ভাঙা অবস্থায় বেরোয়, তার মধ্যে ভাল ভাল টুকরোগুলো বেছে নিতে হয়।

বড় বড় দূরবীণের জন্য দু হাত তিন হাত বা তার চাইতেও চওড়া নিখুঁৎ কাঁচের চাক্তির দরকার হয়। সে রকম কাঁচ করবার মতো

কারিকর পৃথিবীতে খুব কমই আছে। পৃথিবীর যত বড় বড় দূরবীণ তার প্রায় সমস্তগুলিরই কাঁচ ঢালাই হয় ফ্রান্সের একটিমাত্র কারখানায়। সেখানে গরম পাত্রে গরম কাঁচ ঢেলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ আস্তে আস্তে চুল্লি জুড়িয়ে, নানারকম তোয়াজ করে, তারপর কাঁচ খানাকে বার করা হয়। তবু প্রায়ই দেখা যায় কাঁচ ফেটে চৌচির হয়ে আছে। এই রকমে বার বার ঢালাই করে, বার বার ভেঙে যায়। হয়ত বিশ-ত্রিশবার চেষ্টা করে তারপর একখানি নিখুঁৎ কাঁচ বেরোয়। এই জন্যেই সে কাঁচের এত দাম। এক একখানি কাঁচের জন্য হয়ত দশ বিশ হাজার বা লাখ দুই লাখ টাকা দাম লেগে যায়। আমেরিকার একটি প্রকাণ্ড দূরবীণের জন্য সাড়ে পাঁচ হাত চওড়া একখানি কাঁচের দরকার। তার জন্য যত টাকাই লাগুক তারা তা দিতে প্রস্তুত। আজ তেরো বছর ধরে সেই কাঁচ ঢালাই করবার চেষ্টা চলছে, কিন্তু এই এতদিন পরে সবে সেদিন মাত্র শোনা গেল যে, সে কাঁচ নাকি ঢালাই হয়ে আমেরিকায় আসছে। কাঁচখানির ওজন হবে একশ কুড়ি মণ আর তার দাম প্রায় দশ লক্ষ টাকা।



ডুবুরী

জলের তলায় ডুব দিয়ে যাদের কাজ করতে হয় তাদের বলে ডুবুরী। লোকে যে-সকল দামী মুক্তা দিয়ে গহনা বানায় সেই মুক্তাগুলি জন্মায় সমুদ্রের নিচে এক জাতীয় ঝিনুকের মধ্যে। ঝিনুক থেকে একরকম রস বেরিয়ে খোলার মধ্যে ফোড়ার মতো হয়ে জমে থাকে—তাকে আমরা বলি 'মুক্তা'। সবচেয়ে বড় আর ভাল যেসব মুক্তা, সেগুলি জন্মায় একরকম পোকার উৎপাতে। সেই পোকার কেমন বদ অভ্যাস, সে সুবিধা পেলেই ঝিনুকের খোলার মধ্যে ঢুকে ঝিনুক বেচারাকে অস্থির করে তোলে। ঝিনুকও তখন বেশ করে রস ঢেলে দিয়ে তাকে জীয়ন্ত কবর দিয়ে রাখে। সেই পোকার কবরগুলিকে ডুবুরীরা সমুদ্রের তলা থেকে কুড়িয়ে আনে, আর সৌখিন লোকে হাজার হাজার টাকা দিয়ে সেগুলি কিনে যত্ন করে তুলে রাখে।

যেসব মুক্তা অল্প জলে থাকে ডুবুরীরা কেবল সেইগুলিকেই আনতে পারে—কারণ বড়জোর দেড়শ হাতের বেশি এ-পর্যন্ত কোন ডুবুরীই নামতে পারেনি। এমন অনেক ডুবুরী আছে যারা শুধু একটা পাথর-বাঁধা দড়ি নিয়ে দম বন্ধ করে প্রায় দেড় মিনিট কি দু-মিনিট ৩০/৪০ হাত জলের নিচে থাকতে পারে। কিন্তু আজকালকার ডুবুরীরা একরকম অদ্ভুত পোশাক পরে জলে নামে। ডুবুরীর পিঠে একটা দড়ি বাঁধা থাকে, তাই টেনে ডুবুরী উপরের লোকদের ইশারা করে আর তারা তাকে উঠায় নামায়। ডুবুরীর মাথায় একটা লোহার মুখোশ—তাতে পুরু কাচের জানালা বসান, তাই দিয়ে সে দেখতে পায়—আর টুপির আগায় একটা নল তা দিয়ে উপর থেকে বাতাস আসে, তবে সে নিশ্বাস ফেলতে পারে। পোষাকটি এমন যে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোনখান

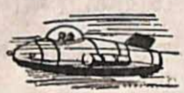
দিয়ে এক ফোঁটাও জল ঢুকতে পারে না। ডুবুরীদের পায়ে প্রকাণ্ড ভারি সীসার জুতো আর পিঠেও সীসার বোঝা। জলের নিচে কাজ করার বিপদ অনেকরকম! প্রথম ভয় এই যে যদি পোশাকের মধ্যে কোনরকমে জল ঢুকতে পারে তবে ডুবুরীকে পিষে থ্যাঁৎলা করে ফেলবে। পোশাকটিকে সমস্তক্ষণ বাতাস দিয়ে ফুটবলের মতো পাম্প করে রাখতে হয়, তাহলেই ডুবুরী আর জলের চাপ টের পায় না। ঐ জোরে পাম্প-করা বাতাস যখন পোশাকের মধ্যে ঢোকে তখন ডুবুরীর গায়ের সমস্ত রক্ত আর রস বোতলে পোরা সোডা ওয়াটারের মতো সেই বাতাস শুষে নেয়। এ অবস্থায় যদি তাকে হঠাৎ উপরে টেনে তোল, তবে সোডার বোতল খুললে যা হয় তার শরীরের মধ্যে তেমনি একটা কাণ্ড চলতে থাকে। এইরকমে কত লোক মারা গেছে। সেইজন্য তুলবার সময়ে খুব সাবধানে আস্তে আস্তে দড়ি টানতে হয় আর মাঝে মাঝে থামাতে হয়। যদি পোশাকটি ভাল করে এঁটে পরা না হয়, আর সীসার বোঝাটি কোনরকম খুলে যায় তবে ডুবুরী তৎক্ষণাৎ বিদ্যুতের মতো ছিটকিয়ে উপরে ভেসে উঠবে, তাতেও তার হাড়গোড় চুরমার হয়ে যেতে পারে। এসব ছাড়া হাঙর বা অন্য জলজন্তুর ভয়ত আছেই। ডুবুরীরা হাঙরের চাইতেও ভয় করে 'অক্টোপাস'কে। পিটার স্নেল একজন নামজাদা ডুবুরী ছিল। সে একবার জলে নামতেই একটা প্রকাণ্ড অক্টোপাস শুঁড়ের মতো আট পা জড়িয়ে ধরল। ভয়ে স্নেল পাগলের মতো ছুরি চালাতে চালাতে তার দড়ি ধরে প্রাণপণে টানতে লাগল। অনেক টানাটানির পর যখন তাকে প্রায় আধমরা অবস্থায় উপরে তোলা হল, তখনও জানোয়ারটার কয়েকটা কাটা পা তার গায়ে লেগে ছিল! তার ওজন প্রায় আধ মণ।

আর একটি জিনিস আছে যাকে ডুবুরী দিয়ে কুড়িয়ে এনে লোকে তার ব্যবসা করে। তাকে আমরা বলি 'স্পঞ্জ'—সেই যে ফুটোওয়ালা নরম জিনিস যাতে জল শুষে নেয় আবার চাপ দিলে জল বেরিয়ে যায়। স্পঞ্জ জিনিসটা একরকম অদ্ভুত জলজন্তুর খোলস বা কঙ্কাল বা বাসা—

যা ইচ্ছা বলতে পার। সমুদ্রের তলায় স্পঞ্জের দল সার বেঁধে মাটি আঁকড়িয়ে পড়ে থাকে, ডুবুরীরা তাকে সেখান থেকে ছিনিয়ে আনে।

রাউল নামে একজন লোক স্পঞ্জ তুলবার জন্য একরকম ডুবুরী গাড়ি তৈরি করেছেন। দুজন ডুবুরী তার মধ্যে স্বচ্ছন্দে বসতে পারে। স্পঞ্জ দেখবার জন্য গাড়ির সামনে একটা উজ্জ্বল আলো থাকে। গাড়ির নিচে চাকা আর পিছনে দুটো দাঁড়, তাতেই তার চলা ফিরা চলে। আর সামনে ডাণ্ডার আগায় একটা হাঁ-করা মতন জিনিস আছে—ঐটা দিয়ে স্পঞ্জ আঁকড়ে আনে।

আজকাল ডুবুরীর পোশাকের নানারকম উন্নতি হয়েছে—কোনটার পিঠে বাতাসের বন্দোবস্ত, তার আলাদা নল লাগে না, কোনটার মধ্যে টেলিফোনের কল, উপরের সঙ্গে কথাবার্তা চলে, আর কোনটার এমন সুবিধা আছে যে ডুবুরী ইচ্ছা করলে কারও সাহায্য ছাড়াই উপরে উঠতে পারে।



ডুবুরী জাহাজ

প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে একজন ফরাসী লেখক একটা গল্প লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এক অদ্ভুত জাহাজের কথা ছিল। সে জাহাজকে মাছের মতো জলের উপর বা নিচ দিয়া যেমন ইচ্ছা চালান যাইত। সে সময়ে লোকের কাছে গল্পটা খুবই অসম্ভব গোছের শুনাইয়াছিল এবং অনেকে গল্পলেখকের 'আজগুবি' কল্পনার প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর এরূপ গল্পে লোকের আশ্চর্য হইবার কথা নয়, কারণ, বাস্তবিকই ঐরকম জাহাজ এখন অনেকগুলি তৈয়ার হইয়াছে। শুধু ইংলণ্ডেই এখন অন্তত পঁচাশিটা এইরূপ জাহাজ আছে।

জাহাজটা যতক্ষণ জলের উপরে থাকে ততক্ষণ তাহার পিঠে নানারকম মাস্তুল দড়ি, কলকব্জা ইত্যাদি দেখা যায় কিন্তু জাহাজ ডুব মারিবার আগে এ সমস্ত গুটাইয়া লওয়া হয়। তখন কেবল দুটি চোঙা আর একটি টুপির মতো ঢাকনি জাহাজের উপরে থাকে। ঢাকনিটার গায়ে পুরু কাঁচের সারসি দেওয়া থাকে, তাহার ভিতর দিয়া জাহাজের কাপ্তান বাহিরের সমস্ত দেখিতে পান। জাহাজটা যতক্ষণ আধ-ডোবা অবস্থায় থাকে ততক্ষণ এইভাবে দেখার কাজ চলিতে পারে, কিন্তু আর কয়েক হাত ডুবিলেই সে পথ বন্ধ। তখন ঐ চোঙা দুটিই চোখের কাজ করে—চোঙার আগায় আয়না ও কাচ শুদ্ধ একটি যন্ত্র বসান থাকে, যন্ত্রটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারিদিকে তাকাইতে থাকে—আর জাহাজের কাপ্তান নিচে বসিয়া সেই আয়নার সাহায্যে বাহিরের সমস্ত অবস্থা দেখিতে পান। দশ হাতের নিচে গেলে এই 'দিকবীক্ষণ' যন্ত্রও ডুবিয়া যায়, তখন কেবল আন্দাজে আর কম্পাস দেখিয়া জাহাজ চালাইতে হয়।

জাহাজের মধ্যে একটা লোহার চৌবাচ্চা থাকে, চৌবাচ্চাটা খালি থাকিলে জাহাজ জলের উপরে ভাসে কিন্তু চৌবাচ্চাটার মধ্যে জল ভরিলে জাহাজ ভারি হইয়া ক্রমে ডুবিয়া যায়। এইরকমে জল বাড়াইয়া বা কমাইয়া জাহাজকে অল্প বা বেশি ডুবান যায়। তাড়াতাড়ি জল ভরিবার জন্য জাহাজের মধ্যে বড় বড় 'পাম্প' কল রাখা হয়, তাহার সাহায্যে এক মিনিটের মধ্যে জাহাজকে পঞ্চাশ হাত জলের নিচে যেমন ইচ্ছা ফিরান যায়। পিছন দিকে দুইটা পাখার মতো ইস্ক্রুপ ঘুরিতে থাকে তাহাই জল কাটিয়া জাহাজকে চালায়। জাহাজের ভিতরে বড় বড় লোহার বোতলে চাপ দিয়া বাতাস ভরিয়া রাখা হয়। তাহাতে জাহাজের বাতাস অনেকক্ষণ পরিষ্কার রাখিবার সুবিধা হয় এবং অন্যান্য কাজও চালান যায়। ক্রমাগত চব্বিশ ঘণ্টা জলের নিচে থাকিলেও জাহাজের লোকেরা কোনরকম অসুবিধা বোধ করে না। জাহাজে এরূপ বন্দোবস্ত করা যায় যাহাতে একটা জাহাজ কোথাও না থামিয়া চার হাজার মাইল স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারে।

মনে কর আমরা এইরূপ একটা জাহাজের মধ্যে ঢুকিয়াছি, ঢুকিয়াই সকলের আগে চোখে পড়ে—জাহাজের এক মাথা হইতে আর এক মাথা পর্যন্ত কেবল চাকা আর লোহা আর কলকব্জা। চেয়ার টেবিল আসবাবপত্র নাই বলিলেই হয়। সমস্ত জাহাজটা যেন একটা প্রকাণ্ড বৈদ্যুতিক কারখানা, সেই বিদ্যুতে জাহাজ চলে এবং জাহাজের বাতি জ্বালা রান্না করা পর্যন্ত সমস্ত কাজ হয়। জাহাজের কাপ্তান কোথায়? ঐ যে তিনি জাহাজের 'টুপি'র নিচে বসিয়া দিকবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া চারিদিক দেখিতেছেন।

কাপ্তান উপর হইতে হুকুম করিতেছেন। প্রত্যেক লোক তাহার নিজের নিজের জায়গায় প্রস্তুত হইয়া আছে, কখন কি হুকুম আসে! কাপ্তান বলিলেন 'জাহাজ ডাইনে ফিরাও', অমনি একটা চাকা ঘুরাইবামাত্র জাহাজ ডাইনে ফিরিয়া গেল। 'থাম! টর্পিডোওয়ালা, প্রস্তুত হও।' টর্পিডো কেন? শত্রুপক্ষের জাহাজ দেখা গিয়াছে।

টর্পিডো বড় সাংঘাতিক অস্ত্র। একবার বিপক্ষের জাহাজে ভালমত টর্পিডো দাগিতে পারিলে আর দ্বিতীয়বার মারিবার দরকার হয় না। একটা প্রকাণ্ড ছুঁচোবাজির মতো তার চেহারা—তার ভিতরে বারুদ আর অদ্ভুত কল-কারখানা। ডুবুরি জাহাজের সামনেই টর্পিডোর কলখানা—সেই কলের চাবি টিপিলেই টর্পিডো ঘণ্টায় ৪০০ মাইল বেগে ছুটিয়া বাহির হয় এবং বিপক্ষের জাহাজে বা অন্য কোন শক্ত জিনিসে ঠেকিয়া বাধা পাইবামাত্র ভয়ানক শব্দে ফাটিয়া ও জাহাজ ফাটাইয়া এক তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া দেয়। বড় ডুবুরি জাহাজে ৩/৪টি পর্যন্ত টর্পিডো কল থাকে। 'টর্পিডোওয়ালা প্রস্তুত হও!' হুকুম আসিবা মাত্র তাহারা প্রস্তুত। সকলেই জানিয়াছে বিপক্ষের জাহাজ আসিতেছে—কাহারও মুখে টু শব্দটি নাই। জাহাজের মধ্যে কেবল কলের বন্ বন্ শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নাই।

হুকুম আসিল '৪০ হাত নামাও'—বলিতে বলিতে জাহাজ ডুবিতে লাগিল। একটা কলের কাঁটা আস্তে আস্তে সরিয়া যাইতে লাগিল—২০ হাত, ২৫ হাত, ৩০ হাত। ৪০-এর দাগে কাঁটা নামিল। এখন আর বাহিরের কিছুই দেখা যায় না। কাপ্তান এখন ঘড়ির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছেন। বিপক্ষের জাহাজটি ঠিক কোনদিকে এবং কত দূরে তিনি খুব ভাল করিয়া তাহার হিসাব লইয়াছেন, তাঁহার জাহাজ কিরকম জোরে চলিতেছে তাহাও তিনি জানেন—সুতরাং তিনি ঠিক বলিতে পারেন কোন মুহূর্তে দুই জাহাজে কতখানি তফাৎ থাকিবে। নিঃশব্দে জলের নিচে জাহাজ চলিতেছে—শত্রুজাহাজ কিন্তু তাহার কিছুই জানে না। 'জাহাজ উঠিতে দাও'—আবার কলের কাঁটা নড়িয়া উঠিল—'ত্রিশ হাত, বিশ হাত, দশ হাত—ব্যস!' 'সম্মুখের টর্পিডো হুঁশিয়ার হও!' এতক্ষণে দিকবীক্ষণ যন্ত্র ভাসিয়া উঠিয়াছে—আবার সব দেখা যাইতেছে। আধ মাইল দূরে শত্রুর জাহাজ। প্রায় ২০টা ডুবুরির সমান। কাপ্তান একমনে হিসাব করিতেছেন জাহাজটা আরেকটু, আরেকটু—ব্যস! 'ছাড়!' একটা ভয়ানক ধাক্কা লাগিল,

'ডুবুরি জাহাজ কাঁপিতে কাঁপিতে প্রায় কাৎ হইয়া গেল, হালের নাবিক তাড়াতাড়ি তাহাকে সামলাইয়া লইল। কিন্তু বিপক্ষের জাহাজে যে টর্পিডো লাগিল সে আর সামলাইতে পারিল না। জাহাজের গায়ে বিশ হাত গর্ত—জাহাজটা মাতালের মতো টলিতে টলিতে গব্ গব্ করিয়া জল খাইতে লাগিল, তারপর মাথা নিচু করিয়া ডিগবাজী খাইয়া দেখিতে দেখিতে এত বড় জাহাজটা ডুবিয়া গেল।

ডুবুরি কিন্তু সেখানে দাঁড়াইয়া থাকে নাই—সে একেবারে ডুব মারিয়া প্রাণপণে ছুটিয়াছে। যতক্ষণ সে তাহার 'চোখটুকু মাত্র বাহির করিয়া চোরের মতো আসিতেছিল শত্রুরা তাহাকে দেখিতে পারে নাই, কিন্তু টর্পিডো ছাড়িবামাত্র জল তোলপাড় হইয়া উঠিল—আর সকলেই বুঝিতে পারিল 'ঐ ডুবুরি'। বিপক্ষের কামান হইতে একটি গোলা যদি ডুবুরির ঘাড়ে পড়ে তবে তার রক্ষা নাই। শুধু যে যুদ্ধের সময়েই ডুবুরি জাহাজের বিপদের ভয় থাকে তাহা নয়। জলের পথে চলা-ফিরা করিতে গিয়া তাহার যে কতরকম দুর্ঘটনা ঘটে ভাবিলেও ভয় হয়। জলের নিচ হইতে উঠিয়া গিয়া হয়ত কোন জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া গেল। হয়ত কোনখানে এতটুকু ফাঁক, কোথায় কলের কব্জা এতটুকু বেঠিক বসিয়াছে—আর অমনি জাহাজ বিগড়াইয়া একেবারে পাথরের মতো ডুবিয়া গেল—শত চেষ্টায়ও আর তাহাকে উঠান গেল না। এরকম কতবার ঘটিয়াছে এবং কত লোক তাহাতে মারা গিয়াছে! জাহাজ ডুবিয়া গেল, ডুবুরি নামাইয়া দেখা গেল ভিতরে মানুষ বাঁচিয়া আছে, ঠক্ ঠক্ শব্দ করিলে তাহারা ভিতর হইতে সাড়া দেয়, অথচ তাহাদের বাঁচাইবার কোন উপায় নাই। যাহাতে এরকম দুর্ঘটনা না হয়, তাহার জন্য প্রতি বৎসর কত নূতন নূতন বন্দোবস্ত করা হইতেছে এবং জাহাজ ডুবিলেও যাহাতে ভিতরের লোকেরা পালাইয়া আসিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা হইতেছে।



জলস্তম্ভ

স্রোতের জলে যে জিনিস ভাসে, স্রোত যেদিকে যায় সে-ও সেইদিকে ভেসে চলে। জলের মধ্যে যদি দুটো স্রোত পাশাপাশি দুই দিকে চলতে থাকে তাহলে দুটো উল্টো টানের মাঝে পড়ে একটি ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি হয়। ঘূর্ণিপাকের মধ্যে যা কিছু এসে পড়ে সবই পাকের সঙ্গে চক্রের মতো ঘুরতে থাকে।

জলে যেমন, বাতাসেও তেমনি। যদি একসঙ্গে দুটো বাতাসের স্রোত পাশাপাশি দুই মুখে চলতে থাকে তাহলেই বাতাসের মধ্যে একটি ঘোরপাক তৈরি হয়। খড়কুটো ধুলোবালি ধোঁয়া, যা কিছু সেই ঘোর-পাকের মধ্যে পড়ে সব চর্কিবাজির মতো ঘুরতে থাকে। যদি দুই মুখেই বাতাসের বেশ জোর থাকে তাহলে সেই ঘোরপাক থেকে সাংঘাতিক ঘূর্ণিবায়ুর জন্ম হতে পারে। যেদিকে বাতাসের জোর বেশি, ঘূর্ণিবায়ু ঘোরপাক খেতে খেতে সেইদিকে ছুটে চলে। ছোটখাট ঘূর্ণিবায়ু তোমরা বোধহয় সকলেই দেখেছ। হঠাৎ কোথা থেকে বাতাস উঠল আর সেই সঙ্গে খানিকটা ধুলো আর কাগজ আর শুকনো পাতা ঘুরতে ঘুরতে উড়তে লাগল। এইরকম তামাসা অনেক সময়েই দেখা যায়। কিন্তু এই ঘূর্ণি বায়ুই যখন আবার খুব বড় আকার নিয়ে দেখ দেয় তখন তার চেহারা অতি সাংঘাতিক হয়।

ঘূর্ণিপাকের চক্র যখন নিচের দিকে নামতে থাকে তখন যদি সেই ঘুরন্ত বাতাসের চেহারাটা দেখতে পেতাম তাহলে দেখতাম ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড চূড়োওয়ালা টুপি উল্টো করে ঝুলিয়ে রেখেছে। জলে যে ঘূর্ণিপাক হয়, তাঁর মাঝখানটায় যেরকম গর্ত হয় তেমনি এরও

মাঝখানটা ফাঁপা। টুপির চূড়োটা যতই লম্বা হতে হতে মাটির কাছ পর্যন্ত নামে ততই নিচের সমস্ত হাল্কা জিনিসকে ঐ ফাঁপা জায়গাটুকুর মধ্যে শুষে নিতে থাকে।

'হাল্কা জিনিস' বললাম বটে, কিন্তু তেমন তেমন ঘূর্ণিবায়ু হলে তার কাছে প্রায় সব জিনিসই হাল্কা হয়ে যায়। খাটবিছানা বাড়ির চালা, এসব ত উড়ে যায়ই, পাঁচ-সাতজন মানুষ শুদ্ধ আস্ত মোটর গাড়ি পর্যন্ত শুকনো পাতার মতো ঘোরপাক খেয়ে শূন্যে উঠে পড়ে।

অনেক সময়ে বাতাসের জল জমে ঘূর্ণিবায়ুর থলিটির মধ্যে জড় হতে থাকে। কিন্তু সে জল বৃষ্টি হয়ে নামতে পারে না. একেবারে হাজার হাজার মণ জল অন্ধকার মেঘের মতো আকাশে ঝুলে ঘুরপাক খেতে থাকে। বড় বড় বিল বা নদী কিংবা সমুদ্রের উপরেই সাধারণত এইরকম হয়। তখন কেবল যে উপরের বাতাস কালো থলির মতো হয়ে নিচের দিকে নামতে থাকে তা নয়, নিচের জলও চূড়োর মতো উঁচু হয়ে ঘুরতে ঘুরতে উপরদিকে উড়তে থাকে। নিচেকার চূড়োটি যখন উপরের ঘুরন্ত মেঘের সঙ্গে মিলে যায় তখনই বড় বড় থামের মতো জলস্তম্ভেব সৃষ্টি হয়। তখন দেখতে মনে হয়, যেন জল থেকে আকাশ পর্যন্ত এক একটা প্রকাণ্ড থাম জলের উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে।

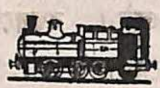
নৌকোই বল আর জাহাজই বল, সে যত বড় আর যত মজবুতই হোক না কেন, জলস্তম্ভের মধ্যে পড়লে আর রক্ষা নাই। জাহাজের কাছে জলস্তম্ভ উপস্থিত হলে তার ঘূর্ণিটান এড়িয়ে চলা জাহাজের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে ঘূর্ণিজলের স্তম্ভ তেমনি করে জাহাজকে টেনে নেয়। স্তম্ভের ভিতরে ঢুকলে জাহাজের লোকদের আর কিছু করবার উপায় থাকে না। জাহাজ বন্ বন্ করে ঘুরতে থাকে, অনেক সময় জল ছেড়ে শূন্যে উঠে যায়—চারিদিকে ভোঁ-ভোঁ শব্দে কানে তালা লেগে যায়, অন্ধকারে আর জলের ঝাপটায় কিছু দেখবার সাধ্য থাকে না।

তারপর স্তম্ভ যখন ভীষণ শব্দে ফেটে যায় তখন হচ্ছে আসল

বিপদ। একেবারে হাজার মণ জল বাজ পড়ার মতো আওয়াজ করে মাথার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জাহাজ-টাহাজ সব চূরমার করে দেয়। সমুদ্রের জল তার ধাক্কায় বহুদূর অবধি তোলপাড় হয়ে ওঠে। বহুদূরের জাহাজ পর্যন্ত তার সাংঘাতিক ঢেউয়ে টল্‌মল্‌ করতে থাকে।

কিছুদিন আগে আমেরিকার এক সাহেব কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে এক প্রকাণ্ড মোটরে চড়ে একটা বিলের ধার দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন আকাশ থেকে একটা কালো মেঘের মতো কি যেন ঘুরতে ঘুরতে নিচের দিকে নেমে আসল, আর বিলের উপর থেকে খানিকটা জল ছিটকে উঠে তার সঙ্গে মিলে একটা স্তম্ভের মতো হয়ে গেল। দেখতে দেখতে স্তম্ভটা বিলের উপর দিয়ে তেড়ে এসে মোটর গাড়ির উপর পড়ে, গাড়িটাকে সোঁ করে শূন্যে তুলে, পাহাড়ের উপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। গাড়ির আরোহীরা কেউ মরল, কেউ সাংঘাতিক জখম হল আর প্রকাণ্ড গাড়িখানা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

যদি সর্বদাই যখন তখন এরকম বড় বড় জলস্তম্ভ দেখা দিত তাহলে সেটা খুবই ভয়ের কথা হত, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এরকম সচরাচর দেখা যায় না। তেমন বড় জলস্তম্ভ অতি অল্পই দেখা যায় তাও থাকে অতি অল্প সময়।



রেলগাড়ির কথা

এমন কত জিনিস আছে যা আমরা সর্বদাই দেখে থাকি এবং তাতে কিছুমাত্র আশ্চর্যবোধ করি না। অথচ, সেই সব জিনিসই যখন প্রথম লোকে দেখেছিল, তখন খুব একটা হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল। প্রথম যে বেচারা ছাতা মাথায় দিয়ে ইংলণ্ডের রাস্তায় বেরিয়েছিল, তাকে সবাই মিলে ঢিল ছুঁড়ে এমনি তাড়াহুড়ো করেছিল যে, বেচারার প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

সার ওয়াল্টার র‍্যালে যখন বিলাতে আলু আর তামাকের প্রচলন করলেন, তখনও তাঁকে রীতিমত নাকাল হতে হয়েছিল। শোনা যায়, তিনি একদিন খুব আরাম করে নিজের ঘরে বসে 'পাইপ' মুখে দিয়ে তামাক টানছিলেন, এমন সময় তাঁর চাকর এসে সেই ব্যাপার দেখে, মনিবের মুখে আগুন লেগেছে মনে করে, একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। কি করবে কিছু বুঝতে না পেরে সে এক বালতি জল নিয়ে সার ওয়াল্টারের মাথায় ঢেলে দিল। আলু খেতেও প্রথমটা লোকে কম আপত্তি করেনি। 'আলু ভয়ানক বিষাক্ত জিনিস' 'আলু খেয়ে লোক মরে যাচ্ছে', এইরকম সব অদ্ভুত চারিদিক রাষ্ট্র হয়ে বহুদিন পর্যন্ত লোকের মনে ভয় জন্মিয়ে রেখেছিল।

কলকাতায় হাওড়ার পোল যখন তৈরি হয়নি, তখন একজন সাহেব বলেন যে নৌকার উপর খিলান ভাসিয়ে এইরকম পোল তৈরি হতে পারে। এ কথাটা সে সময়ে লোকের কাছে এমনই অদ্ভুত ঠেকেছিল যে খবরের কাগজে পর্যন্ত সেই বেচারার নামে নানারকম ঠাট্টা তামাসা বেরিয়েছিল। অথচ এখন হাজার হাজার লোকে প্রতিদিন পোলের

উপর যাওয়া-আসা করছে—সেটা বাস্তবিক একটা অদ্ভুত ব্যাপার কিনা, কেউ সে কথা ভেবে দেখবার অবসর পায় না।

রেলগাড়ির প্রচলনও এমনি করেই হয়েছিল। প্রায় একশ বৎসর আগে জর্জ ষ্টিফেনসন বাষ্পের জোরে গাড়ি চালিয়ে তাতে লোকের যাতায়াতের ব্যবস্থা করবার প্রস্তাব করেন। তখন সে প্রস্তাবে এতরকম আপত্তি উঠেছিল যে, ক্রমে তর্কটা পার্লামেণ্ট পর্যন্ত গড়ায়। শেষটায় অনেক ঝগড়াঝাটি গণ্ডগোলের পর, ষ্টিফেনসনকে নানারকম জেরা করে তারপর অনুমতি দেওয়া হল, 'আচ্ছা, তোমার রেলগাড়িটা না হয় একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক!' ষ্টিফেনসন সহজে জেদ ছাড়বার লোক ছিলেন না—তাই তিনি শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে ছাড়েননি।

এই জর্জ ষ্টিফেনসনের জীবনের কথা অতি অদ্ভূত। নিতান্ত গরীবের ঘরে যার জন্ম, যে লেখাপড়ার কোনরকম সুযোগ পায়নি এবং ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত কেবল কয়লার খনিতে সামান্য কাজ করেই জীবন কাটিয়েছে, তার মনে এমন আশ্চর্য শক্তি আসে কোথা হতে, ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। ষ্টিফেনসনেরা ছয় ভাইবোন। বাপ মা অত্যন্ত গরীব, কাজেই ছেলেবেলা থেকেই সব ক-টি ভাইকে টাকা উপার্জনের চেষ্টা করতে হত। তারা নানান কাজ করে একেকজন দিনে প্রায় দু আনা রোজগার করত। খনিতে নানারকম কল-কারখানা থাকে, সেইগুলার উপর জর্জের ভারি নজর ছিল। সুযোগ পেলেই সে গুলোকে নেড়েচেড়ে তার ভিতরের কলকব্জা খুলে দেখত। বইটই কিছুমাত্র না পড়েও কেবল নিজে দেখেশুনে এ সকল বিষয়ে তার আশ্চর্য দখল জন্মেছিল। সে সময়ে কয়লার খনিতে যে-সকল এঞ্জিন ব্যবহার হত তাদের 'খাড়া এঞ্জিন' বলা যায়—অর্থাৎ সে এঞ্জিন এক জায়গায় খাটান থাকে, তার চাকার সঙ্গে দড়ি, শিকল বা লোহার হাতল জুড়ে গাড়ি টানা, মোট বওয়া, জিনিসপত্র উঠান-নামান প্রভৃতি নানারকম কাজ চালান হয়। সেই সময় হতেই চাকায়-বসান চলন্ত

এঞ্জিন গড়বার খেয়াল ষ্টিফেনসনের মাথায় চেপেছিল।

যাহোক ক্রমে ষ্টিফেনসনের অবস্থার উন্নতি হতে লাগল। ক্রমে তার সপ্তাহে ১২ শিলিং (নয় টাকা) মাইনে হল—তার উপর জুতো সেলাই করে আর ঘড়ি মেরামত করেও সে কিছু কিছু উপার্জন করতে লাগল। সকলে বলল 'জর্জ মস্ত রোজগেরে হয়েছে।' এইভাবে প্রায় ত্রিশ বৎসর কেটে গেল, এর মধ্যেই পাকা এঞ্জিনিয়ার বলে ষ্টিফেন-সনের বেশ একটু নাম হয়েছে।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ৩৩ বৎসর বয়সে এক খনির মালিককে রাজি করিয়ে ষ্টিফেনসন তাঁর প্রথম চলন্ত এঞ্জিনের পরীক্ষা করেন। এই এঞ্জিনের পরীক্ষা করেন। এই এঞ্জিনের সঙ্গে কয়লার গাড়ি জুড়ে দেখা গেল যে ৫০০ মণ কয়লা উঁচু রাস্তায় ঘণ্টায় চার মাইল করে নেওয়া যায়। আগে ট্রামের লাইন বসিয়ে তার উপর লোকেরা গাড়ি ঠেলে নিত, সেই লাইনের উপরই এঞ্জিন বসিয়ে কয়লা চালান হতে লাগল। তারপর বছর খানেকের মধ্যে আরো ভাল ছুটি এঞ্জিন তৈয়ারি হল। ক্রমে আশেপাশে আরও কত কয়লার খনিতে ষ্টিফেনসনের এঞ্জিন চলতে লাগল। এমনি করে আট-দশ বৎসর কেটে গেল।

তখন ষ্টকটন হতে ডার্লিংটন পর্যন্ত কয়েক মাইল ট্রামের লাইন বসিয়ে ঘোড়ার ট্রাম করবার কথা হচ্ছিল। ষ্টিফেনসন প্রস্তাব করলেন, ঐ লাইনের উপর এঞ্জিনের গাড়ি চালান হোক। অনেক কথাবার্তা হাঁটাহাঁটির পর, ট্রামের কর্তারা রাজি হলেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে এই লাইন যেদিন খোলা হল তখন 'ষ্টিফেনসনের লোহার ঘোড়া' দেখবার জন্য ভিড় জমে গিয়েছিল। কয়লা আর ময়দার বোঝাই হয়ে একগাড়ি যাত্রী নিয়ে ষ্টিফেনসন নিজে তার ড্রাইভার। গাড়ির আগে আগে কোম্পানির লোক ঘোড়ায় চড়ে নিশান নিয়ে ছুটল! কিন্তু ষ্টিফেনসন তাঁর এঞ্জিনে পুরো দম দিয়ে এমন ছুটিয়ে দিলেন যে, সে লোকটির আর আর সঙ্গে যাওয়া হল না। ডার্লিংটনে সমস্ত মালপত্র নামিয়ে সমস্ত ট্রেনটিকে পঙ্গপালের মতো লোক-বোঝাই করে ষ্টিফেনসন ষ্টকটনে ফিরে

এলেন। না জানি সে সময়ে লোকের মনে কিরকম উৎসাহ হয়েছিল।

কিন্তু এতেও গোলমাল মিটল না। এরপর যখন মানচেষ্টার থেকে লিভারপুল পর্যন্ত রেল করবার কথা হল, তখন আবার তুমুল ঝগড়া আরম্ভ হল। রেলগাড়ি জিনিসটাতেই অনেকের আপত্তি, কেউ কেউ তাকে 'শয়তানের যন্ত্র' বলে গাল দিতেও ছাড়েনি। এর মধ্যে আবার অন্য কয়েকটি এঞ্জিনওয়ালা এসে বললেন 'আমরা আরো ভাল এঞ্জিন বানিয়েছি—আমাদের উপর ভার দাও।' কেউ বললেন 'ষ্টিফেনসন আবার কোথাকার কে ? নাম জানি না, এত বড় কাজের ভার কি যার তার উপর দেওয়া যায় ?' তখন চারিদিক থেকে পার্লামেণ্টের কাছে দরখাস্ত যেতে লাগল। পার্লামেণ্টের হুকুমে সব এঞ্জিন এক জায়গায় আনিয়ে তার পরীক্ষা নেওয়া হল। পরীক্ষায় ষ্টিফেনসনের এঞ্জিন আর সবকটাকে একেবারে পিছনে ফেলে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল ছুটে সকলের মনে এমন তাক লাগিয়ে দিল যে, যারা ঝগড়া করতে এসেছিল তাদের আর কথাটি কইবার মুখ রইল না। এঞ্জিনওয়ালারা তাদেয় এঞ্জিনের ঝ্যাঁক্-ঝাঁকানি বন্ধ করে লজ্জায় বাড়ি চলে গেল।

এমনি করে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রীতিমত রেলের চলাচল আরম্ভ হল। তারপর কত এঞ্জিন তৈরি হল, কত দিকে কত রেলের লাইন বসে গেল, গরীবের ছেলে ষ্টিফেনসন মস্ত ধনীলোক হয়ে গেলেন। কিন্তু জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁর সাদাসিধা চালচলন আর সহজ সরল ব্যবহারের কোন পরিবর্তন হয়নি। ষ্টিফেনসনের একমাত্র ছেলে রবার্টও কালে একজন নামজাদা এঞ্জিনিয়ার হয়েছিলেন, রেলের পোল তৈরি বিষয়ে তাঁর বিশেষরকম সুনাম ছিল।



বেগের কথা

যে লোক সৌখিন, সামান্য কষ্টেই কাতর হইয়া পড়ে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় 'ফুলের ঘায় মূর্ছা যায়। রঘুবংশে আছে যে দশরথের মা ইন্দুমতী সত্যসত্যই ফুলের ঘায়ে মূর্ছা নয়, একেবারে মারাই গিয়াছিলেন। ইন্দ্রের পারিজাতমালা আকাশ হইতে তাঁহার গায়ে পড়ায় তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রথম যখন এই বর্ণনাটা শুনিয়াছিলাম তখন ইহাকে অসম্ভব কল্পনা বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কিন্তু এখন ভাবিয়া দেখিতেছি ইহা নিতান্ত অসম্ভব কিছু নয়।

তাল গাছের উপর হইতে ভাদ্রমাসের তাল যদি ধুপ করিয়া পিঠে পড়ে তবে তার আঘাতটা খুবই সাংঘাতিক হয়; কিন্তু ঐ তালটাই যদি তাল গাছ হইতে না পড়িয়া ঐ পেয়ারা গাছ হইতে এক হাত নীচে তোমার পিঠের উপর পড়িত, তাহা হইলে এতটা চোট লাগিত না। কেন লাগিত না? কারণ, বেগ কম হইত। কোন জিনিস যখন উঁচু হইতে পড়িতে থাকে তখন সে যতই পড়ে ততই তার বেগ বাড়িয়া চলে। যে হাড়ের টুকরাটি দোতলা হইতে একতলায় মানুষের মাথায় পড়িলে বিশেষ কোনই অনিষ্ট হয় না—সেইটিই যখন চিলের মুখ হইতে পড়িতে পড়িতে অনেক নীচে প্রবল বেগে আসিয়া নামে তখন তাহার আঘাতে মানুষ রীতিমত জখম হইতে পারে। ফুলের মালাটিকেও যদি যথেষ্ট উঁচু হইতে ফেলিয়া দেওয়া যায় তবে তাহার আঘাতটি যে একেবারেই মোলায়েম হইবে না, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

ঘূর্ণী বায়ুর সময় সামান্য খড়কুটা পর্যন্ত যে ঝড়ের বেগে গাছের ছালে বিঁধিয়া যায়, ইহা অনেক সময়েই দেখা যায়। একটা নরম

মোমবাতিকে বন্দুকের মধ্যে পুরিয়া গুলির মত করিয়া ছুটাইলে সে যে পুরু তক্ত ফুটা করিয়া যায়, ইহাও মানুষে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে। বন্দুকের গুলি জিনিসটা আসলে খুব মারাত্মক নয়, হাতে ছুঁড়িয়া মারিলে তাহাতে চোট্ লাগিতে পারে, কিন্তু সে চোট খুব সাংঘাতিক হয় না। কিন্তু সেই জিনিস যখন বন্দুকের ভিতর হইতে বারুদের ধাক্কায় প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া বাহির হয় তখন আস্ত মানুষটাকে এপার-ওপার ফুঁড়িয়াও তাহার রোখ থামিতে চায় না।

জলের কল হইতে যে জলধারা পড়িতে থাকে, তাহার মধ্যে আঙ্গুল চালাইয়া দেখ, যেটুকু বাধা বোধ করিবে তাহা নিতান্তই সামান্য। কিন্তু ঐ রকম সরু একটি জলের ধারা যখন খুব প্রবল বেগে ছুটিয়া বাহির হয় তখন মনে হয় সে যেন লোহার মতো শক্ত, তখন তাহাকে কুড়াল দিয়াও কাটা যায় না। ফ্রান্সের একটা কারখানায় চারশত হাত উঁচু পাহাড় হইতে জলের স্রোত আনিয়া তাহার জোরে কল চালান হয়। সেই জল যখন এক আঙুল মোটা একটি নলের ভিতর হইতে ভীষণ তোড়ে বাহির হয়, তখন তাহাতে তলোয়ার দিয়া কোপ মারিলে তলোয়ার ভাঙিয়া খান খান হইয়া যায়। এমন কি, বন্দুকের গুলিও তাহাকে ভেদ করিতে পারে না, তাহাতে ঠেকিয়া ঠিকরাইয়া পড়ে। আমেরিকার কোন কোন কারখানার নর্দমা দিয়া যে জল পড়ে তাহার উপর কুড়াল মারিয়া দেখা গিয়াছে, জলের মধ্যে কুড়াল বসে না, জলের এমন বেগ।

চলন্ত জিনিস মাত্রেরই এইরূপ একটা ধাক্কা দিবার ও বাধা দিবার শক্তি আছে। পণ্ডিতেরা বলেন, জগতে যা কিছু তেজ দেখি, যে কোন শক্তির পরিচয় পাই, সমস্তই এই চলার রকমারি মাত্র। বাতাসে ঢেউ উঠিল, অমনি শব্দ আসিয়া কানে আঘাত করিল, আকাশে তরঙ্গ ছুটিল, অমনি চোখের মধ্যে আলোর ঝিলিক জ্বলিল। কেবল তাহাই নয়, প্রত্যেক ধূলিকণার মধ্যে কোটি কোটি পরমাণু ছুটাছুটি করিতেছে। ভিতরের এই ছুটাছুটি বাড়িলেই সব জিনিস গরম হইয়া উঠে। যখন

ঠাণ্ডা হয়, তেজ কমিয়া আসে তখন বুঝিবে এই পরমাণুর ছুটাছুটি ঢিমাইয়া পড়িতেছে।

যে জিনিসটা ছুটিতে চায় তাহাকে বাধা দিলে সে গরম হইয়া ওঠে। তাহার বাহিরের বেগ বন্ধ হইয়া তখন ভিতরে পরমাণুর বেগকে বাড়াইয়া তোলে। বন্দুকের গুলিটা লোহায় লাগিয়া থামিয়া গেল, হাত দিয়া দেখ, এত গরম যে হাতে ফোস্কা পড়িবে। একটা শক্ত জিনিসের উপর ক্রমাগত হাতুড়ি মার হাতুড়ির বেগ যতবার বাধা পাইবে ততই দেখিবে হাতুড়িটা গরম হইয়া উঠিতেছে—আর যাধার উপর আঘাত করিতেছে, তাহাকেও গরম করিয়া তুলিতেছে। রেলগাড়ি যখন লোহার রেলের উপর দিয়া যায় তখন চাকার সঙ্গে রেলের ঘষা লাগিয়া সে ক্রমাগত বাধা পাইতে থাকে। ট্রেন চলিয়া যাইবার পর যদি রেলের উপর হাত দিয়া দেখ, দেখিবে লোহাগুলি বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছে। ট্রেন যখন ষ্টেশনে আসিয়া থামে, তখন তাহার চাকায় হাত দিলে দস্তুরমত গরম বোধ হয়।

কেবল যে কঠিন জিনিসেই বাধা দেয় তাহা নয়, বাতাসের মতো হাল্কা জিনিসের বাধা দিবার শক্তি আছে। খুব বড় একটা পাখা লইয়া জোরে চালাইতে গেলে বেশ বোঝা যায় যে বাতাসের ঠেলা লাগিতেছে। তোমরা নিশ্চয়ই উল্কা দেখিয়াছ। মাঝে মাঝে আকাশে যে তারার মতো জিনিসগুলি হঠাৎ কোথা হইতে বোঁ করিয়া ছুট দিয়া পালায়, সেগুলিই উল্কা। উল্কাগুলি এই পৃথিবীরই মতো ভীষণভাবে ঘণ্টায় পঞ্চাশ হাজার বা লক্ষ মাইল বেগে ছুটিতে থাকে। বাহিরের আকাশ তাহাকে বাধা দেয় না, কিন্তু দৈবাৎ যদি সে পৃথিবীর বাতাসের মধ্যে আসিয়া পড়ে অমনি বাতাস তাহাকে বাধা দিতে থাকে। এই বাধাতেই তাহার বেগ কমিয়া যায়, সে গরমে জ্বলিয়া আগুন হয়। সেই আগুনকে ছুটিতে দেখিয়া আমরা বলি 'ঐ উল্কা পড়িল।'

পৃথিবীর তুলনায় উল্কাগুলি নিতান্তই ছোট। তাই তাহাদের ধাক্কায় পৃথিবীর কোন ক্ষতি হয় না, উল্কাগুলিই মরিয়া শেষ হয়। কিন্তু দুইটা

বড় বড় পৃথিবী যদি এই রকম ছুটাছুটি করিয়া ধাক্কা লাগায় তবে তবে কাণ্ডটা কি রকম হয়! মানুষের কল্পনা তাহার ধারণাই করিতে পারে না। দুইটার মধ্যে যখন ধাক্কা লাগে তখন তাহাদের প্রচণ্ড বেগ বাধা পাইবামাত্র জ্বালিয়া আগুন হইয়া বাহির হয়। সেই আগুন হইতে পাহাড় প্রমাণ স্ফুলিঙ্গ চারিদিকে হাজারে হাজারে ছুটিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে দুই পৃথিবীর শেষ চিহ্ন ঘুচিয়া গিয়া কেবল লক্ষ লক্ষ মাইল জুড়িয়া আগুনের শিখা জ্বলিতে থাকে। এরূপ ঘটনা যে একেবারেই হয় না তাহা নয়। কিছুদিন আগে যে 'নূতন তারা' দেখা গিয়াছিল তাহাও এইরূপ একটা লুপ্তবেগের আগুনমাত্র; কবে ব্রহ্মাণ্ডের কোন কিনারে এই আগুন জ্বলিয়াছিল। তাহারই জ্বলন্ত কিরণ আকাশে তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিতে ছুটিতে এতদিনে আমাদের চোখে আসিয়া আঘাত করিয়া গেল। সেই যে আলোকের বেগ, তাহার কাছে আর সমস্ত বেগই হার মানিয়া যায়। কামানের গোলা এত যে প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া যায়, তাহার গতিও আলোকের গতির তুলনায় যেন রেলগাড়ির কাছে শামুকের চলার মতো।



শিকারী গাছ

উপযুক্তরকম জল মাটি বাতাস আর সূর্যের আলো পাইলেই গাছেরা বেশ খুশী থাকে, আর তাহাতেই তাহাদের রীতিমত শরীর পুষ্টি হয় আমরা ত বরাবর এইরকমই দেখি এবং শুনি। তাহারা যে আবার পোকা মাকড় খাইতে চায়, শিকার ধরিবার জন্য নানারকম অদ্ভুত ফাঁদ খাটাইয়া রাখে এবং বাগে পাইলে পাখিটা ইঁদুরটা পর্যন্ত হজম করিয়া ফেলে, এ কথাটা চট্ করিয়া বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে পৃথিবীর নানা জায়গায় নানা জাতীয় গাছ এই শিকারী বিদ্যা শিখিয়াছে। তাহারা যে সখ করিয়া পোকা খাওয়া অভ্যাস করিয়াছে তাহা নয়, ঠেলায় পড়িয়াই ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছে। অনেক শিকারী গাছের বাস এমন স্যাঁৎসেতে জায়গায় এবং সেই সকল জায়গা গাছের পক্ষে এত অস্বাস্থ্যকর যে সেখানে তাহারা তাহাদের শরীর রক্ষার উপযোগী মাল-মসলা ভাল করিয়া জোগাড় করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায়, দু-একটা পোকা মাছি বা ফড়িং যদি তাহারা খাইতে না পারিত তবে তাহাদের বাঁচিয়া থাকাই মুস্কিল হইত।

আগেই বলিয়াছি, শিকারী গাছ নানারকমের আছে। ইহাদের শিকার ধরিবার জায়গাও নানারকম। কোন কোন গাছের পাতায় মাছি বা পোকা বসিলে পাতাগুলি আস্তে আস্তে গুটাইয়া যায়। মাছি বেচারা কিছুই জানে না, নিশ্চিন্ত মনে পাতার রস খাইতেছিল, হঠাৎ দেখে চারিদিকে ঘেরা, তাহার মধ্যে সে বন্দী! পাতার গায়ে লোমের মতো সরু কাঁটা, তাহারই মুখে আঠার মতো রস লাগানো থাকে; সেই রসে আটকাইয়া শিকারের পালাইবার আরও অসুবিধা হয়। শুধু

তাহাই নহে, পাতা গুটাইয়া গেলে পরে সেই সকল কাঁটার মুখ হইতে একরকম তীব্র হজমি রস বাহির হয় তখন পোকাটা যতই ছটফট করে ততই আরও বেশি করিয়া রস বাহির হয়। তাহাতেই শিকার মরিয়া শেষে হজম হইয়া যায়। তারপর আপনা হইতেই আবার পাতা খুলিয়া যায়। জলের মধ্যে একরকম গাছ থাকে, তাহার সাদা ফুল, জলের ধারে একটা খুব রংচঙে গাছ থাকে, তাহার পাতাগুলির চেহারা কতকটা কদম ফুল গোছের আর একরকমের গাছ থাকে তাহাতে ঠিক যেন মোচার খোলের মতো পাতা সাজান। এই সবগুলিই এক প্রকারের শিকারী গাছ এবং ইহাদের শিকার ধরিবার কায়দাও প্রায় একরকম। মনে কর, একটা মস্ত পোকা ওই কদম ফুলের মতো গাছটিতে উঠিয়াছে। আর একটু পরেই গাছের পাতাগুলি গুটাইয়া মাঝখানে আসিয়া মিলিবে—একটি ফুটন্ত ফুল মুড়িয়া আবার কুঁড়ি হইয়া গেলে যেমন হয়, সেইরূপ! তখন পোকা বেচারার আর পলাইবার পথ থাকিবে না।

আর একরকমের অদ্ভুত গাছ আছে, এক একটা পাতার আগায় গোলাপী রঙের কি একটা জিনিস, তার চারিদিকে কাঁটা। এই জিনিসগুলি ফ্লাই-ট্রাপ (মাছি-মারা ফাঁদ)। এক একটা ফাঁদ যেন মাঝখানে কব্জা দিয়া আটকান, বইয়ের মতো খোলে আবার বন্ধ হয়। কোন পোকা হয়ত পাতায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কোন বিপদের চিহ্নও নাই; ঘুরিতে ঘুরিতে সে ওই ফাঁদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত। হয়ত দূরে থাকিয়া তাহার ঐ রংটা খুব পছন্দ হইয়াছিল — তাই সে দেখিতে আসিল ব্যাপারখানা কি। কিন্তু সে ত জানে না যে ফাঁদের গায়ে সরু সূতার মতো কি লাগান রহিয়াছে, তাহাতে ছুঁইলেই ফাঁদ ছুটিয়া একেবারে বেমালুম বন্ধ হইয়া গেল। এখানে আর আঠার দরকার নাই, কারণ ফাঁদটি রীতিমত মজবুত এবং খুব চটপট কাজ সারে। আর একরকন শিকারী গাছ আছে, তাহাদের শিকার ধরিবার জন্য থলি বা চোঙা থাকে। এই থলি বা চোঙার মধ্যে পোকা বেশ

সহজেই ঢুকিতে পারে কিন্তু বাহির হওয়া তত সহজ নয়। ইহাদের ভিতর সরু সরু কাঁটা থাকে, সেগুলির মুখ সব নীচের দিকে, আর তার গায়ে মোমের মতো একরকম কি মাখান থাকে, তাহাতে পোকাগুলি বেশ সহজেই সুড় সুড় করিয়া পিছলাইয়া নামিতে পারে। কিন্তু উপরে উঠিবার সময় ত আর পিছলাইয়া উঠা যায় না তা ছাড়া কাঁটার খোঁচাও যথেষ্ট খাইতে হয়। এইসকল থলির তলায় প্রায়ই জল জমিয়া থাকে, পোকা যখন বার বার পালাইবার চেষ্টা করিয়া হয়রান হইয়া পড়ে, তখন সেই জলের মধ্যে পড়িয়া মারা যায়। এইসকল গাছে পোকাকে ফাঁকি দিবার এতরকম উপায় থাকে যে ভাবিলে অবাক হইতে হয়। কোনটার মুখে ঢাকনি থাকে, সে ঢাকনির উপর হইতে চাপ দিলে খুলিয়া যায়! কিন্তু ভিতর হইতে ঠেলিলে খোলে না। প্রায় সবগুলিরই মুখের কাছে খুব সুন্দর রঙিন কাজ আর তার চারিদিকে মধু। সেই মধু খাইতে খাইতে পোকা ভিতরের দিকে ঢুকিতে থাকে—যত খায় তত মিষ্টি! শেষে এক জায়গায় গিয়া দেখে তাহার পরে আর মধু নাই, তখন সে ফিরিতে চায়! কিন্তু ফিরিতে আর পারে না। কোন কোন থলির ভিতরে খানিকটা জায়গা স্বচ্ছ মতন—ঠিক যেন সার্সি। পোকাগুলি মনে করে এই পলাইবার পথ—আর ক্রমাগত সেই সারসির গায়ে উড়িয়া উড়িয়া হয়রান হইয়া পড়ে। কখন কখন এমনও হয় কোন ছোট পাখি বা ইঁদুর হয়ত জল খাইতে আসিয়া ফাঁদের মধ্যে পড়িয়া যায় এবং আর বাহির হইতে না পারিয়া প্রাণ হারায়!



গাছের ডাকাতি

ধীর শান্ত ক্ষমাশীল লোকের কথা বলতে হলে আমাদের দেশে গাছের সঙ্গে তার তুলনা দেওয়া হয়, 'তরোরিব সহিষ্ণুণা।' গাছের মহত্বের কথা ছেলেবেলায় কত যে পড়েছি এখনও তার কিছু কিছু মনে পড়ে। 'ছেত্তুঃ পার্শ্বগতচ্ছায়াং নোপসংহরতি দ্রুম', যে লোক পাশে বসে গাছের ডাল কাটছে তার কাছ থেকেও গাছ তার ছায়াটুকু সরিয়ে নেয় না। আরও শুনেছি, 'কঠিন অপ্রিয় বাক্য করিলে শ্রবণ, রক্তজবা রাগ ধরে মনুজ লোচন। ইহাদের শিরোপরে লোষ্ট্র নিক্ষেপণে, সুফল প্রদান করে বিনম্র বদনে।' এমন যে শান্ত নিরীহ গাছ সে-ও নাকি আবার অত্যাচার করে। নানারকম কৌশল করে, বিষ ঢেলে, ফাঁদ পেতে, হুল ফুটিয়ে, সঙ্গিন চালিয়ে, গোলা মেরে, সাঁড়াশি বিঁধিয়ে কত উপায়ে যে তারা দৌরাত্ম্য করে তা শুনলে পরে তোমরা বলবে 'গাছের পেটে এত বিদ্যে!'

এর আগে শিকারী গাছের কথা বলেছি। তাতে গাছেরা কেমন করে আশ্চর্য রকম ফাঁদ পেতে পোকামাকড় ধরে খায়, তার গল্প দেওয়া হয়েছিল। তারা নানারকম লোভ দেখিয়ে, রঙের ছটায় মন ভুলিয়ে পোকাদের সব ডেকে আনে। কিন্তু যারা আসে তারা আর ফিরে যায় না। মধু খেতে খেতে কখন যে তারা ফাঁদের মধ্যে গিয়ে পড়ে সেটা তাদের খেয়ালই থাকে না। কখন হঠাৎ টপ্ করে ফাঁদের মুখ বুজে যায়, কিংবা গাছের আঠাল রসে তাদের পা আটকিয়ে যায়, কিংবা ফাঁদের মধ্যে পিছল পথে উঠতে গিয়ে আর উঠতে পারে না তখন বেচারাদের ছটফটানি সার। এরা মাংসাশী গাছ, পোকামাকড় খেয়ে

এরা বেঁচে থাকে তাই প্রাণের দায়ে একটু-আধটু হিংসাবৃত্তি না করলে এদের চলবে কেন ?

খোঁজ করলে দেখা যায়, অনেক সময় গাছ গাছেও লড়াই চলে। অল্পে অল্পে দিনের পর দিন নিঃশব্দে সে লড়াই চলতে থাকে। এক জায়গায় দশ বিশটা গাছ থাকলেই তাদের মধ্যে কিছু না কিছু রেষা-রেষি বেধে যায়। সকলেই চায় প্রাণ ভরে আলো আর বাতাস পেতে, সুতরাং যারা প্রবল তারা গায়ের জোরে সকলকে ঠেলে-ঠুলে বেড়ে ওঠে আর দুর্বল বেচারিরা আড়ালে অন্ধকারে শুকিয়ে মরে।

এক একরকম গাছ থেকে তাদের কেমন অভ্যাস, তারা অন্য গাছের গায়ে পড়ে পাক দিয়ে উঠে তারপর তাদের চিপ্‌সে মারে; এক এক সময় দেখা যায়, একটা গাছ সিন্ধবাদের বুড়োর মতো আর একটা গাছের ঘাড়ে চেপে রয়েছে। গাছের অন্য বিদ্যা যেমনই থাক, সে ত হনুমানের মতো লাফাতে পারে না, তাহলে সে অন্যের ঘাড়ে চড়ল কি করে? চড়তে হয়নি, ঐ ঘাড়ের উপরেই তার জন্ম হয়েছে। ঐখানে কবে কোন পাখি এসে ফলের বীজ ফেলে গেছে, সুবিধা পেয়ে সেই বীজ এখন ডালপালা মেলে, মাটি পর্যন্ত শিকড় ঝুলিয়ে প্রকাণ্ড গাছ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে নীচের গাছটার খুবই আপত্তি থাকবার কথা, কিন্তু আপত্তি থাকলেই বা শোনে কে? যেখানে সেখানে জন্ম নিয়ে বেড়ে ওঠায় এক একটি গাছের বেশ বাহাদুরি দেখা যায়। আমাদের দেশের অশ্বথ গাছ এ বিষয়ে একেবারে পাকা ওস্তাদ। ছাদে দালানে পোড়ো মন্দিরে অন্য গাছের ঘাড়ে, কারখানার চিমনির চূড়ায়, যেখানে তাকে সুযোগ দেবে সেখানেই সে মাথা বাঁচিয়া বেড়ে উঠবে। বটগাছের জন্মও অনেক সময়ে অন্য গাছের ঘাড়ের উপর হয়, সেইখানে বাড়তে বাড়তে সে যখন বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয় তখন নীচের গাছটিকে সে অল্পে অল্পে ফাঁস দিয়ে চেপে মারে। এই রকম করে সে বড় বড় তালগাছকেও কাবু করে ফেলতে পারে।

আর একদল গাছ আছে তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সব সময় তৈরি থাকে,

পাছে কেউ তাদের অনিষ্ট করে। শুকনা বালির দেশে মনসা গাছের বাড়তি খুব বেশি। মনসা গাছের পুরু ছাল, তার মধ্যে জলভরা নরম শাঁস, তাতে ক্ষুধাও মেটে তৃষ্ণাও দূর হয়। কিন্তু মনসা গাছের গা-ভরা কাঁটা, জানোয়ারের সাধ্য কি তার কাছে ঘেঁষে। গরু ছাগলে কত সময়ে ক্ষুধার তাড়ায় কাঁটার কথা ভুলে গিয়ে মনসা গাছে মুখ দিতে গিয়ে নাকে মুখে কাঁটার খোঁচা খেয়ে রক্তাক্ত হয়ে পালিয়ে আসে। মনসা জাতীয় গাছ নানারকমের হয়, কোনটা ছোটখাট, তার পুরু পুরু চ্যাটাল পাতা, কোনটার পাতা নেই একেবারে থামের মতো খাড়া, কোনটার চেহারা ঝোপের মতো, কোনটা ভুট্টার মতো, কোনটা চল্লিশ হাত লম্বা, কোনটা বড় জোর এক হাত কি দেড় হাত। কিন্তু এক বিষয়ে সবাই সমান, সকলের গায়ে সজারুর মতো কাঁটা। কোনটার কদমফুলের মতো চেহারা, দেখে হাত দিতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু একটিবার হাত দিলেই বুঝবে কেমন মজা।

এই গাছগুলির কাঁটা এক এক সময়ে এমন সরু হয় যে, হঠাৎ দেখলে বোঝা যায়, কিন্তু ধরতে গেলে একেবারে ঝাঁকে ঝাঁকে কাঁটা চামড়ার মধ্যে ফুটে যায়। কাঁটাওয়ালা গাছ নানারকমের আছে, তার মধ্যে কোন কোনটি শুধু কাঁটাতেই সন্তুষ্ট নয়, তারা কাঁটার মধ্যে বিষ ভরে রাখে। তাতে কাঁটার খোঁচা আর বিষের জ্বালা দুটোই বেশ একসঙ্গে টের পাওয়া যায়। আবার দু-একটার কাঁটা নিতান্তই সামান্য, সরু শুঁয়ার মতো কিন্তু তাদের বিষ বড় তেজাল। বিছুটির পাতা অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে মনে হয় যেন অসংখ্য হুল উঁচিয়ে আছে, তাতে হাত দিবা মাত্র তার আগাটুকু ভেঙে গিয়ে ভিতর থেকে বিষাক্ত রস বেরিয়ে আসে। এক এক জাতীয় বিছুটি আছে, তাদের বিষে অসহ্য-রকম যন্ত্রণা হয় এবং সপ্তাহ ভরে তার জের চলে। এক সাহেব একবার এই রকম এক বিছুটি ঘাঁটতে গিয়ে তারপর নয় দিন শয্যাগত ছিলেন। তিনি বলেছেন যে বিছুটি লাগবার পর সারাদিন তার মনে হত যেন তপ্ত লোহা দিয়ে কে তার হাড়ের মধ্যে ঘা মারছে।

'ওল খেয়ো না ধরবে গলা', এ কথা আমিও জানি তোমরাও জান। কিন্তু জঙ্গলের ধারে যখন বুনো ওলের নধর সবুজ পাতাগুলো ছড়িয়ে থাকে, তা খেলে যে গলা ধরবে এ কথা গরু ছাগলে কি করে জানবে? এইসব পাতার মধ্যে ছুঁচের চাইতেও সরু অতি সূক্ষ্ম দানা থাকে, সেই-গুলি গলায় জিভে ফুটে মুখের অবস্থা সাংঘাতিক করে তোলে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপে এক রকম বেত পাওয়া যায় তার পাতা খেলে গলা ফুলে কথা ত বন্ধ হয়ই, অনেক সময় দম্ বন্ধ হয়ে যেতে চায়। শুনা যায়, সেখানকার নিষ্ঠুর দাস ব্যবসায়ীরা এই পাতা খাইয়ে ক্রীত-দাসদের শাসন করত। এই বেতের নাম ডাম্ব্ ক্যাইন বা 'বোবা বেত।'

আত্মরক্ষার জন্যেই অধিকাংশ গাছে নানারকমের ফন্দি-ফিকিরের আশ্রয় নেয়। কিন্তু কেবল নিজেকে বাঁচিয়েই সকলে সন্তুষ্ট নয়, বংশ-রক্ষার জন্যেও তাদের যে সব উপায় খাটাতে হয় সেগুলিও এক এক সময় কম সাংঘাতিক নয়। অনেক গাছের ফল বা বীজ দেখা যায় যেন কাঁটায় ভরা। এই রকম কাঁটাওয়ালা ফল সহজেই নানা জানোয়ারের গায়ের চামড়ায় লেগে এক জায়গায় ফল আর এক জায়গায় গিয়ে পড়ে। তাতে জানোয়ারের অসুবিধা খুবই হতে পারে, কিন্তু গাছের বংশ বিস্তারের খুব সুবিধে হয়। এক একটা ফলের কাঁটায় সাজ অনাবশ্যকরকমের সাংঘাতিক বলে মনে হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় এক রকম ফল হয় সে ফল মানুষে খায় না, তার গুণের মধ্যে তার প্রকাণ্ড দুইটি বঁড়শির মতো শিং আছে, তার একটি কোন জন্তুর গায়ে বিঁধলে তার সাধ্য কি যে ছাড়িয়ে ফেলে। অনেক সময় দেখা গিয়েছে, এই ফলের কামড় ছাড়তে গিয়ে গরু ছাগল বা হরিণের মুখের মধ্যে বঁড়শি আটকে গিয়াছে। পোষা জন্তু হলে মানুষের সাহায্যে সে উদ্ধার পেয়ে যায়, কিন্তু বনের জন্তু নিরুপায়। তারা কেবল অস্থির হয়ে পাগলের মতো ছুটে বেড়ায়—তাতে আধ-খোলা ফলের ভিতরকার বিচিগুলো চারিদিকে ছিটিয়ে পড়বার সুযোগ পায়, কিন্তু নিরীহ জন্তুর

প্রাণটি যায়। এই ফলকে সে দেশের লোকে 'শয়তানের শিং' বলে।

এর চাইতেও ভয়ানক হচ্ছে আফ্রিকার সিংহ-মারা ফল। আঁকড়শির মতো চেহারা, তার চারিদিকে 'বাঘনখা' ফলের মতো বড় বড় নখ। নখের গায়ে ভীষণরকম কাঁটা, তাদের এক এক মুখ এক এক দিকে—একটাকে ছাড়াতে গেলে আর একটা বেশি করে বিঁধে যায়। প্রতি বছর সে দেশে হাজার হাজার হরিণ, ভেড়া আর ছাগল এই ভাবে জখম হয়। যেখানে নখ বসে সেখানে ঘা হয়ে পচে ওঠে, তাতে ফল যদি খসে যায় তাহলে কতক রক্ষা। না হলে শেষটায় প্রাণ নিয়ে টানাটানি। স্বয়ং পশুরাজ সিংহও যে এর হাত থেকে সকল সময়ে নিস্তার পেয়ে থাকেন তা নয়। এর জন্যে সিংহের প্রাণ দিতে হয়েছে এমনও দেখা গিয়েছে।

আর এক রকম গাছ আছে, তাদের ফল পাকলে ফেটে যায় আর ভিতরের বিচিগুলো সব ছিটিয়ে পড়ে। কোন কোন গাছে এই বীজ ছড়ান কাজটি বেশ একটু জোরের সঙ্গে হয়। এক বাঁদরের গল্প শুনেছি, সে খুব বাহাদুরি করে গিলার গাছে বসে বসে মুখ ভ্যাংচাচ্ছিল। গিলার ফল হয় বড় বড় সিমের মতো—সেগুলি পেকে পটকার মতো আওয়াজ করে ফেটে যায় আর চারিদিকে গিলা ছিটায়। বাঁদর ত সে খবর রাখে না, সে আরাম করে ল্যাজ ঝুলিয়ে বসে খুব একটা উৎকটরকম দুষ্টুমির ফন্দি আঁটছে। এমন সময় ফট করে গিলা ফেটে তার কানের কাছে চাঁটি মেরে গেল। বাঁদরটা হঠাৎ হাত পা ছেড়ে পড়তে পড়তে সামলে গেল—তারপর দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ফিরে দেখে কেউ নেই। এ রকম অদ্ভুত কাণ্ড দেখে তার ভয় হল, না কি হল, তা জানি না—কিন্তু সে এক লাফে সেই যে পালাল, একেবারে বিশ ত্রিশটা গাছ না ডিঙিয়ে আর থামল না। দক্ষিণ আমেরিকার এক রকম ফল আছে, সে এই বিদ্যাতে গিলার চাইতেও ওস্তাদ। তার ফলগুলো ফাটবার সময় বন্দুকের মতো আওয়াজ করে আর তার ভিতরকার বিচিগুলো

এমন জোরে ছুটে যায় যে ভালো করে তার চোট লাগলে মানুষ পর্যন্ত জখম হতে পারে।

ছেলেবেলায় এক রকম গাছের গল্প পড়েছিলাম, তারা নাকি মানুষ ধরে টেনে খায়। কিন্তু আজকাল পণ্ডিতেরা এ কথা বিশ্বাস করেন না—কারণ অনেক খোঁজ করেও সে গাছের কোন রকম প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যে গাছ পোকামাকড় খায়, সে সুযোগ পেলে পাখিটা বা ইঁদুরটা পর্যন্ত হজম করতে পারে। কিন্তু সে যদি মানুষ পর্যন্ত খেতে আরম্ভ করে তাহলে ত আর রক্ষা নেই।



রাবণের চিতা

লোকে বলে রাবণের চিতায় যে আগুন দেওয়া হয়েছিল সে আগুন নাকি এখনও নিভান হয়নি—এখনও নিভান হয়নি—এখনও তা জ্বলছে। কোথায় গেলে সে আগুন দেখা যায় তা আমি জানি না—কিন্তু এমন আগুন দেখা গেছে যা বছরের পর বছর ক্রমাগতই জ্বলছে, মানুষ তাতে জল ঢেলে মাটি চাপা দিয়ে নানারকমে চেষ্টা করেও তাকে নিভাতে পারেনি।

খনি থেকে কয়লা এনে সেই কয়লা দিয়ে লোকে আগুন জ্বালায়। কিন্তু তা না করে যদি একেবারে খনির মধ্যেই আগুন ধরিয়ে খনিকে খনি জ্বালিয়ে দেওয়া যায় তবে কিরকম হয়? বাস্তবিকই এমন সব কয়লার খনি আছে যার আশেপাশে বারো মাসই আগুন জ্বলে। সেসব খনির লোকেরা সব সময়ে ভয়ে ভয়ে থাকে—কখন সে আগুন খনির মধ্যে এসে পড়ে। কোনদিকে যদি খনির দেয়াল একটু গরম হয় কিংবা খনির কাছে কোন জায়গা যদি বসে-যাবার মতো হয়, তবেই হৈচৈ লেগে যায়—'আগুন আসছে, আগুন আসছে।' খনির একদল লোক আছে তাদের কাজ কেবল আগুন তাড়ান। যেদিক দিয়ে আগুন আসছে বোধ হয় তারা সেইদিকে ইট পাথরের দেয়াল তুলে আগুনের পথ বন্ধ করে দেয়। আগুন তখন বাধ্য হয়ে আর কোন দিক ঠেলে তার পথ করে নেয়। কেমন করে কোথা হতে আগুন আসে তা সব সময়ে বলা যায় না। মাটির নিচে হয়ত বিশ পঁচিশ মাইল জায়গা জুড়ে কয়লার স্তর রয়েছে—কোথাও ১০০ হাত, কোথাও হয়ত পাঁচ হাত মাত্র পুরু। তারই কোনখানে যদি কোন গতিকে আগুন ধরে আর তার আশেপাশে পাহাড়ের ফাটলে যদি বাতাস যথেষ্ট থাকে, তবে সে আগুন একেবারে 'রাবণের চিতা' হয়ে দাঁড়ায়।

খোলা বাতাসে কয়লা যেমন ধূ ধূ করে জ্বলে যায়, মাটির নিচে

তেমন হয় না—সেখানে আগুন যেন শামুকের মতো আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে থাকে। যেদিকে তার পথ খোলা, যেদিকে একটু কয়লা আর বাতাস—আগুন একদিকে হোক এক বছরে হোক সেদিকটা দখল করবেই। অনেক দিন আগে একবার ইংলণ্ডের একটা গির্জা হঠাৎ বসে যেতে আরম্ভ করল—তার দেয়াল মেঝে সব দেখতে দেখতে হাঁ করে উঠল। এঞ্জিনিয়ার এসে মাটি খুঁড়ে দেখেন ১২ হাত নিচেই কয়লার স্তর আর তাতে আগুন লেগেছে—কয়লা যতই পুড়ে যাচ্ছে, উপরের মাটিও ততই ধসে পড়ছে। তখন পরামর্শ করে সকলে গির্জার মেঝেটা খুঁড়ে প্রকাণ্ড একটা ফুটো করলেন। সেই ফুটোর মধ্যে প্রায় এক পুকুর জল ঢেলে দেওয়া হল—তারপর মাটি খুঁড়ে লোহার শিক বসিয়ে তার নিচে দেয়ালের গায়ে দেয়াল তুলে সবাই ভাবল, 'এবারে আগুন জব্দ হয়েছে। কিন্তু সাতাশ বৎসর পরে আবার সেই আগুন কয়লা পুড়িয়ে পুড়িয়ে তিন দিক ঘুরে গির্জার পিছনে এসে হাজির।

অনেকদিন আগে লিভারপুলের কাছে টড্ নদীর ধারে এক কয়লার খনি ছিল। হঠাৎ কেমন করে সেই খনির এক কোণে আগুন লেগে যায়। খনিশুদ্ধ লোক প্রাণপণ চেষ্টা করেও যখন সে আগুন নিভান গেল না, তখন খনির কর্তারা খাল কাটিয়ে টড্ নদীকে খনির মধ্যে ছেড়ে দিলেন। তাতে তখনকার মতো আগুন চাপা পড়ল বটে কিন্তু জলের স্রোত খনির এমন দুরবস্থা করল যে কর্তারা ভয় পেয়ে গেলেন। তারপর যখন কিছুদিন না যেতেই আগুন আবার আর একদিকে এসে উঁকি মারল তখন সকলেই বললেন আগুন নিভাবার চেষ্টা বৃথা—একে কোনরকমে ঠেকিয়ে রাখ। যেদিকে আগুন আসবার ভয় সেদিকের কয়লা সরিয়ে ফেল, বড় বড় খাল কেটে দেয়াল তুলে পথ বন্ধ কর। তাহলেই আগুন আর ছড়াতে পারবে না—ক-দিন বাদে আপনি নিভে যাবে। এইরকমে ছাব্বিশ বছর আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ চলল। একদল লোক কেবল ওই কাজেই দিন রাত লেগে রইল, যারা ছোট ছিল তারা

প্রায় বুড়ো হয়ে এল, খনির পাশে দেয়ালের পর দেয়াল উঠল, আগুনের উপর নিচে চারদিকে ঘেরাও হয়ে গেল—কিন্তু আগুন কি থামতে চায়! দেয়াল ভেঙে, পাথর ফাটিয়ে আগুনের শিখা বারবার দেখা দিতে লাগল, আগুন বেড়েই চলল।

একদিকে যেমন আগুন, আর একদিকে জল! পাহাড়ের ফাটল দিয়ে টড্ নদীর জল এসে খনির মধ্যে দিনরাত পড়ত—সেই জল পাম্পকল দিয়ে ক্রমাগত বাইরে ফেলে দিতে হয়। একদিন টড্ নদীতে জোয়ার লেগে উপরের মাটি খসে গিয়ে কবেকার পুরান এক সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে খনির ভিতরে হুহু করে জল ঢুকল। ভাগ্যিস তখন খনির মধ্যে লোক ছিল না, গোলমাল শুনে তারা সকলে খনির মুখের কাছে দৌড়ে এল। ব্যাপারটা কি বুঝতে কারও বাকী রইল না; সকলেই বলতে লাগল এই জল যদি আগুনে গিয়ে পড়ে, তবে কি হবে? আগুনে জলে যখন দেখা হল তখন কয়েক মিনিট ধরে একটা ভয়ানক গর্জন আর যুদ্ধ চলল—ফুটন্ত জল ফোয়ারার মতো দশ হাত উঁচু হয়ে এমন জোরে ছুটে বেরুল যে তার ধাক্কায় খনির মুখের কলকব্জা সব কোথায় উড়ে গেল। তারপর দেখতে দেখতে সব চুপচাপ! আগুন ঠাণ্ডা হল আর সঙ্গে সঙ্গে খনির দফাও ঠাণ্ডা।

গিরিধির কাছে একটা বয়লার স্তরে আজ ক-বছর হল আগুন ধরেছে। গরমে মাটি ফাটিয়ে পাহাড় তাতিয়ে সে আগুন এখনও জ্বলছে।



মেঘবৃষ্টি

বর্ষাকালে রাস্তায় বাহির হইবার আগে আমরা আকাশের পানে তাকাইয়া দেখি তাহার ভাবগতিক কিরূপ—মেঘ আছে কিনা, বৃষ্টির সম্ভাবনা অথবা ঝড় দেখা যায় কিনা। কিন্তু মেঘ কিরূপে জন্মায়, আকাশ কিরূপে থাকে, মেঘের আকার-প্রকার এবং চালচলন কিরূপ সে কথা ভাবিবার অবসর তখন আমাদের থাকে না।

মেঘের জন্মের কথা বোধহয় তোমরা সকলেই জান। পৃথিবীর খাল, বিল, পুকুর, নদী, সমুদ্রের জল গরমে বাষ্প হইয়া আকাশে মিশিয়া যায়, সেই বাষ্প জমিয়া খুব ছোট ছোট জলকণার সৃষ্টি হয়। এইসকল জলকণার স্তূপকেই আমরা বলি মেঘ। মনে হইতে পারে যে জলকণা বাতাসের চেয়ে ভারি, তাহা হইলে মেঘ কেমন করিয়া শূণ্যে থাকে? বাস্তবিক মেঘ সর্বদাই নীচে নামিতে চেষ্টা করে। কখনও বাতাসের ঠেলায় উপরে উঠিতেও পারে, কিন্তু নীচে নামাই তাহার স্বভাব। যে মেঘের জলকণার আকার যত বড় সে মেঘ তত তাড়াতাড়ি নীচে নামে। জলকণাগুলি আকারে বেশি বড় হইয়া গেলে বৃষ্টির আকারে মাটিতে পড়ে। খুব উঁচুতে যে মেঘ থাকে, তাহাতে অনেক সময় জলকণাগুলি জমিয়া বরফের কণা হইয়া থাকে। এই মেঘ আবার নীচে গরম বাতাসের মধ্যে নামিলে সেই বরফ গলিয়া জলকণা হইয়া যায়। ঠাণ্ডা দেশে এই বরফকণাই তুষার বৃষ্টি হইয়া মাটিতে পড়ে।

অনেক সময় উপরের মেঘ বৃষ্টি হইয়া মাটিতে পৌঁছাইবার আগেই বাষ্প হইয়া মিলিয়া যায়। কাজেই মেঘ আসিলেই যে বৃষ্টি পড়িবে, এ কথা বলা যায় না। শীতের দেশে মাঝে মাঝে একটা বড় মজার

জিনিস দেখা যায়। মেঘের জলকণা খুব ঠাণ্ডা হইয়া নীচে নামিতে নামিতে হঠাৎ কোন গাছপালা অথবা অন্য কোন জিনিসের গায়ে বরফ হইয়া জমিয়া যায়।

মেঘ বৃষ্টি ও ঝড় বাতাসের খবর রাখিবার জন্য সকল সভ্য দেশেই বড় বড় সরকারী অফিস আছে। ইংরাজিতে তাকে বলে মিটিয়র-লজিক্যাল অফিস। এই সমস্ত আফিসের কাজ কেবল মেঘ বাতাস ইত্যাদির নানারকম মাপ-জোখের হিসাব লওয়া। সে কিরকম হিসাব? কোন্‌খানে কত গরম তাহার হিসাব, কোন্‌খানের বাতাস কতখানি ভিজা বা শুকনা তাহার হিসাব, কোন্‌খানে বাতাসের চাপ কিরূপ, বাতাস কতটা হাল্কা বা কতটা ভারি, তাহার হিসাব, বাতাস কতখানি জোরে কোন্‌দিকে চলিতেছে, কোন্‌খানে কতখানি বৃষ্টি পড়িল, কিরকম মেঘ দেখা দিল, তাহার হিসাব।

বাতাস যখন চলে তখন তাহাকে বলে 'হাওয়া', হাওয়া যখন ছোটে তখন তাহার নাম 'ঝড়।' বাতাস আবার চলা-ফিরা করে কেন? গরম লাগিলে ব. জলের বাষ্প মিশিলে বাতাস ছড়াইয়া হাল্কা হইয়া উপর দিকে ভাসিয়া উঠে। তখন তাহার চাপ কমিয়া খানিকটা জায়গা যেন ফাঁকা হইয়া উঠিতে চায়। কিন্তু ফাঁকা হইবার যো নাই, চারি-দিকের চাপে আশপাশ হইতে বাতাস ছুটিয়া সেই হাল্কা জায়গাটাকে দখল করিতে চায়, তাহাতেই বাতাসের চলাচল হয়। বাতাস যখন যেদিকে চলে, সে তখন মেঘগুলিকে শুদ্ধ সেদিকে টানিয়া লইতে থাকে। এইরকম টানাটানির মধ্যে পড়িয়া এক একটা মেঘের এক একরকম চেহারা হইয়া উঠে। যাঁহারা এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকেন তাঁহারা মেঘের চেহারা দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে অনেক অনেক কথা বলিতে পারেন। খুব উঁচুতে ৫/৬ মাইল উপরে যে মেঘ থাকে তাহার চেহারা অতি হাল্কা সূক্ষ্ম চামরের মতো। সে মেঘে বৃষ্টি হয় না, সে মেঘ নীচে নামিতে গেলেই গরম বাতাসে শুকাইয়া মিলাইয়া যায়।

তারপর দু'মাইল চার মাইল উঁচুতে ছিটান তূলার মতো বা চষা-ক্ষেতের মতো যেসব সাদা সাদা মেঘ দেখা যায়, তাহাতেও হঠাৎ বৃষ্টি পড়িবার কোন আশঙ্কা নাই। এই সমস্ত মেঘ যখন সূর্যাস্তের সময়ে লম্বা লম্বা স্তর বাঁধিয়া আকাশের গায়ে শুইয়া থাকে তখন তাহার উপর সূর্যের আলো পড়িয়া কি আশ্চর্য সুন্দর রঙের খেলা দেখা যায়, তাহা সকলেই দেখিয়াছ। বিদ্যুতের যে মেঘ তাহার চেহারাটা খুব গম্ভীর ও জমকালো হয়, সে যেন রাগে ফুলিয়া পাহাড়ে মতো উঁচু হইয়া উঠিতে থাকে কিন্তু বৃষ্টি নামিতে আরম্ভ করিলেই সে দেখিতে দেখিতে শান্ত হইয়া যায়। তখন সে বৃষ্টি মেঘ হইয়া ধোঁয়ার প্রলেপের মতো আকাশের গায়ে লেপিয়া যায়।

বিদ্যুৎ যখন চমকায় তখনই মনে হয় 'এইবার বাজ পড়ার শব্দ শুনিব'—এবং অনেক সময়ই সে শব্দ শোনা যায়। বিদ্যুৎ চমকাইলে বাতাসটা কি রকম তোলপাড় হইয়া উঠে, ওই আওয়াজটা হইতেই তাহা বুঝিতে পার। বিদ্যুতের ঝলক ছুটিবামাত্র চারিদিকে গরম বাতাস ঠিকরাইয়া পড়ে, আবার সেই চোট সামলাইতে গিয়া চারি-দিকের বাতাস ছুটিয়া কড়্ কড়্ শব্দে টক্কর বাধাইয়া বসে। তাহার পরেও খানিকক্ষণ পর্যন্ত বারবার বহু দূরের মেঘ হইতে গুড়্ গুড়্ করিয়া সেই শব্দের প্রতিধ্বনি আসিতে থাকে।

মিটিয়রলজিক্যাল আফিস থাকাতে বৃষ্টি বাদল সম্বন্ধে নানারকম খবর আমরা আগে হইতে জানিতে পারি। 'ঝড় আসিতেছে' এই খবর সময়মত জানিতে পারিলে মানুষ সাবধান হইয়া তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারে। মনে কর, খবর আসিল—এখান হইতে দুই শত মাইল বেগে এই দিকে আসিতেছে। সে যদি বরাবর ঐভাবে এই মুখেই আসে এবং আসিতে আসিতে তাহার বৃষ্টি যদি ফুরাইয়া না যায়, অথবা যদি মাঝে কোথাও গরম শুকনা বাতাসে তাহার মেঘ শুকাইয়া না ফেলে, তবে চার ঘণ্টা পরে এখানে বৃষ্টি হইবে।

মিটিয়রলজিক্যাল আফিসে বড় বড় মানচিত্রে সর্বদাই চারিদিকের খবর আঁকিয়া রাখা হয়। বাতাসের চাপ, বাতাসের বেগ, বাতাসের ভিজা ভাব ও মেঘবৃষ্টি, সব খবর সেই মানচিত্রের গায়ে স্পষ্ট রেখা টানিয়া দেখান হয় এবং বাতাসের ভাবগতিক যেমন ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলাইতে থাকে, মানচিত্রের উপরেও সেই সমস্ত পরিবর্তনের হিসাব ক্রমাগত বদলাইয়া দেখান হয়।



শনির দেশে

কেউ যদি বলে যে, এই পৃথিবীর বাইরে যেখানে বলবে, সেখানে নিয়ে তোমাদের তামাশা দেখিয়ে আনবে—তাহলে তোমরা কোথায় যেতে চাও? আমি জানি, সেরকম হলে আমি নিশ্চয় শনিগ্রহে যেতে চাইব। পৃথিবীর আকাশে আমরা শুধু চোখে যতটুকু দেখতে পাই, তাতে মনে হয় যে, সব চাইতে সুন্দর জিনিস হল চাঁদ। সেখানে একবার যেতে পারলে আর কিছু না হোক, এই পৃথিবীটাকে কেমন মস্ত আর জমকালো চাঁদের মতো দেখায়, সেটা নিশ্চয়ই একটা দেখবার মতো জিনিস। কিন্তু শনিগ্রহে যাবার পথে সেটা আমরা দেখে নিতে পারব।

যাক, মনে কর যেন শনিগ্রহে যাত্রা করাই স্থির হল। মনে কর এমন আশ্চর্য আকাশ-জাহাজ তৈরি হল যাতে পৃথিবী ছেড়ে, পৃথিবীর বাতাস ছেড়ে ফাঁকা শূন্যের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া যায়। তোমার বয়স কত? দশ বৎসর? বেশ! ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আমরা স্বপ্ন-জাহাজে রওনা হলাম শনিগ্রহে যাবার জন্য। আমাদের জাহাজটা মনে কর খুব দ্রুত এরোপ্লেনের মতো ঘণ্টায় ১০০ মাইল বা ১২৫ মাইল করে চলে।

আমরা আকাশের ভিতর দিয়ে হু হু করে চলেছি আর পৃথিবীর ঘর বাড়ি সব ছোট হতে হতে একেবারে মিলিয়ে যাচ্ছে। বড় বড় সহর, বড় বড় নদী সব বিন্দুর মতো, রেখার মতো, হয়ে আসছে। এই গোল পৃথিবীর গায়ে পাহাড় সমুদ্র, দেশ মহাদেশ ক্রমে সব অতি নিখুঁৎ মানচিত্রের মতো দেখা যাচ্ছে। ঐ ফ্যাকাশে হলদে মরুভূমি, ঘন সবুজ বন, ঐ ছেয়ে-নীল সমুদ্র, ঐ সাদা সাদা বরফের দেশ। নভেম্বর মাসে

আমরা এখান থেকে চাঁদ যতদূর, ততদূর চলে গিয়েছি। এক বছরে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আমরা প্রায় দশ লক্ষ মাইল এসে পড়েছি। পৃথিবী থেকে চাঁদটাকে যেমন দেখি এখন পৃথিবীটাকে ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে। হিমালয় পাহাড়কেও আর পাহাড় বলে ভাল বোঝাই যাচ্ছে না। চাঁদের যেমন অমাবস্যা পূর্ণিমা হয়, দিনেদিনে কলায় কলায় বাড়ে কমে, পৃথিবীরও ঠিক তেমনি। এমনি করে বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে, কিন্তু কই? শনিগ্রহ ত একটুও কাছে আসছে বলে মনে হয় না। শুনেছিলাম সে এক প্রকাণ্ড গ্রহ, তার চারিদিকে আংটি ঘেরা। কিন্তু তোমার ত বিশ বছর বয়স হল, গোঁফদাড়ি বেরিয়ে গেল, এখনও ত সে সবের কিছুই দেখা গেল না! ঐ লাল রঙের মঙ্গলগ্রহটা যেন একটুখানি কাছে এসেছে, কিন্তু সেও ত খুব বেশি নয়। আমাদের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতটি বলছেন, মঙ্গল পর্যন্ত পৌঁছতে আরও চল্লিশ বৎসর লাগবে। ও হরি! তাহলে শনিতে পৌঁছব কবে? শনি পর্যন্ত যেতে লাগবে প্রায় আটশ বৎসর! তাহলে উপায়? একমাত্র উপায়, আরও বেগে যাওয়া। আরও পাঁচ গুণ দশ গুণ বিশ গুণ বেগে কামানের গোলার মতো বেগে ঘণ্টায় দু হাজার মাইল বেগে ছুটতে হবে। তাই ছোটা যাক।

আরও দুই বৎসরে মঙ্গল পর্যন্ত এসে পড়া গেল। ওখানে গিয়ে একবার নামলে মন্দ হত না। ঐ লম্বা লম্বা আঁচড়গুলো সত্যিকারের খাল কিনা, ওখানে সত্যি সত্যি বুদ্ধিমান জীব কেউ আছে কিনা, একটিবার খবর নেওয়া যেত। কিন্তু আমাদের ত অত অবসর নেই, যেমনভাবে চলছি এমনি করে চললেও শনিতে পৌঁছতে আরও অন্তত চল্লিশ বৎসর লাগবে। সুতরাং সোজা চলতে থাকি!

মঙ্গলের পথ পার হয়ে এখন বৃহস্পতির দিকে চলেছি। মাঝে মাঝে ছোট বড় গোলার মতো ওগুলো কি সামনে দিয়ে হুস করে ছুটে পালাচ্ছে? কোনটা দশ মাইল, বিশ মাইল, কোনটা একশ বা দুশ মাইল চওড়া—আবার কোনটা ছোট্ট খাট ঢিপির মতো বড়, কোন

কোনটা সামান্য গুলি-গোলার মতো। এরা সবাই গ্রহ। যে নিয়মে বড় বড় গ্রহরা সূর্যের চারিদিকে চক্র দিয়ে ঘোরে—এরাও প্রত্যেকেই, এমনকি যেগুলি ধূলিকণার মতো ছোট সেগুলিও, ঠিক সেই নিয়মেই নিজের নিজের পথে নিজের নিজের তাল বজায় রেখে সূর্যের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়।

এমনি করে ছুটতে ছুটতে আরো দশ বৎসর কেটে গেল, ছোট ছোট গ্রহগুলি আর দেখাই যায় না। পৃথিবী সূর্যের আশেপাশে মিটমিট করে জ্বলছে। সূর্যও দেখতে অনেকখানি ছোট্ট হয়ে গেছে—সেই পৃথিবীর সূর্য আর এ সূর্য যেন ফুটবলটার কাছে একটি ক্রিকেট বল। ক্রমে আরও আরও আট দশ বছর ছুটে, গ্রহরাজ বৃহস্পতির চক্র পথের সীমানায় এসে হাজির হওয়া গেল। কোথায় পৃথিবী আর কোথায় বৃহস্পতি! ৩৬৫ দিনে পৃথিবীর এক বৎসর—কিন্তু বৃহস্পতি যে প্রকাণ্ড পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেই পথে একবার পাড়ি দিতে তার প্রায় বারো বৎসর সময় লাগে। ধোঁয়ায় ঢাকা প্রকাণ্ড শরীর—তার মধ্যে হাজারখানেক পৃথিবীকে অনায়াসেই পুরে রাখা যায়। অথচ এই বিপুল দেহ নিয়েই গ্রহরাজকে লাটিমের মতো ঘোরপাক খেতে হচ্ছে। এ কাজটি করতে পৃথিবীর ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে, কিন্তু বৃহস্পতির দশ ঘণ্টাও লাগে না। বৃহস্পতির চারিদিকে সাত-আটটি চাঁদ—তার মধ্যে চারটি বেশ বড় বড়—তিনটি আমাদের চাঁদের চাইতেও বড়।

বৃহস্পতির এলাকা পার হয়েছি। শনির আলো ক্রমে আরও উজ্জ্বল হয়ে আসছে—ক্রমে বোঝা যাচ্ছে যে, তার চেহারাটা ঠিক অন্য গ্রহের মতো নয়। মনে হয় কেমন যেন লম্বাটে মতন—দুপাশে যেন কি বেরিয়ে আছে। আরও কাছে গিয়ে দেখ তার গায়ের চমৎকার ক্রমে পরিষ্কার হয়ে উঠছে। পৃথিবী থেকে ছোটখাট দূরবীণ দিয়ে যেমন দেখেছি এখন শুধু চোখেই সেইরকম দেখতে পাচ্ছি। আংটিটা বাসনের কানার মতো, উকিলের শাম্‌লার ঘেরের মতো—খুব পাতলা

আর চওড়া। শনিগ্রহকে আমরা যে দেখি, সব সময়ে ঠিক একরকম দেখি না—কখন একটু উঁচু থেকে, কখন একটু নিচু থেকে, কখন আংটির উপর দিকটা, কখন তার তলাটা, কখন সামনে ঝোঁকা, কখন পিছন-হেলান। যখন ঠিক খাড়াভাবে আংটির কিনারা থেকে দেখি, তখন আংটিটাকে দেখি সরু একটি রেখার মতো—এত সরু যে খুব বড় দূরবীণ না হলে দেখাই যায় না।

প্রায় চল্লিশ বৎসর হল আমরা পৃথিবী ছেড়েছি—এখন আর আট-দশ বৎসর গেলে আমরা শনিতে পৌঁছব। ততদিনে তোমার চুল দাড়ি গোঁফ সব পেকে যাবে—তুমি ষাট বছরের বুড়ো হয়ে যাবে। শনিকে অনেকখানি ডাইনে রেখে আমরা ছুটে চলেছি। শনিও ঘুরতে ঘুরতে ঐ বাঁয়ের দিকে আসছে, আর কয়েক বৎসর পরে সে ঠিক আমাদের সামনে এসে হাজির হবে। সেও কিনা সূর্যের প্রজা, কাজেই সূর্যের চারদিকে তাকেও প্রদক্ষিণ করতে হয়। কিন্তু আমাদের উনত্রিশটা বছরেও তার একটা পাক পুরো হয় না।

যাক্—এতদিনে পথের শেষ হয়েছে; আমরা শনিগ্রহের উপরে এসে পৌঁছেছি। 'আংটি'টার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ, আকাশের উপর দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত যেন আলোর খিলান গেঁথে দিয়েছে। খিলানের মধ্যে ঝাপসা আলোর আরেকটি খিলান। তার উপর আবার শনিগ্রহের ছায়া পড়েছে। সূর্যের এই প্রকাণ্ড রাজত্বের মধ্যে যতদূর যাও, এমন দৃশ্য আর কোথাও দেখবে না—আমাদের পৃথিবীর দূরবীণের দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত যায়, এমন জিনিস আর দ্বিতীয় কোথাও পাওয়া যায়নি।

আকাশে কত চাঁদ! একটি নয়, দুটি নয়, একেবারে আট-দশটা চাঁদ—ছোট বড় মাঝারি নানারকমের। সওয়া দশ ঘণ্টায় এখানকার দিন রাত—ঘুমের পক্ষে ভারি অসুবিধা। দিনটিও তেমনি পৃথিবীর রোদ এখানকার চাইতে একশ গুণ কড়া। পৃথিবী থেকে সূর্যকে যদি চায়ের পিরিচের মতো বড় দেখায়, তবে এখান থেকে তাকে দেখায়

আধুলিটার মতো। যখন তখন চন্দ্রগ্রহণ আর সূর্যগ্রহণ ত লেগেই আছে, তার উপর আবার থেকে থেকে চাঁদেও গ্রহণ লেগে যায়, এক চাঁদ আর-এক চাঁদকে ঢেকে ফেলে। এখানকার জন্য যদি পঞ্জিকা তৈরি করতে হয়, তবে তার মধ্যে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কেবল গ্রহণের হিসাব লিখতেই কেটে যাবে।

আংটিগুলি যেন অসংখ্য চাঁদের ঝাঁক—ছোট ছোট ঢিপির মতো, পাথরের ভেলার মতো, কাঁকড়ের কুচির মতো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি চাঁদ কেউ কারও গায়ে ঠেকে না, আশ্চর্য নিয়মে প্রত্যেকে নিজের পথে শনিকে প্রদক্ষিণ করছে। আর সমস্ত মিলে আশ্চর্য সুন্দর আংটির মতো চেহারা হয়েছে।

এখন অসুবিধার কথাটাও একটু ভাবা উচিত। গরম বাতাস আর ধোঁয়ার ঝড় ত এখানে আছেই—তার উপর সব চাইতে অসুবিধা এখানে দাঁড়াবার মতো ডাঙা পাবার যো নাই—ডাঙ্গা খুঁজতে গেলে অনেক হাজার মাইল গভীর গরম ধোঁয়াটে মেঘের সমুদ্রের মধ্যে ডুব দিতে হবে। সেই মেঘের মধ্যে জীবজন্তু কেউ বাঁচতে পারে কিনা খুবই সন্দেহ। সুতরাং এখন কি করার উপায় দেখতে হবে।

এসেছিলাম কামানের গোলার মতন বেগে—কিন্তু তার চাইতে তাড়াতাড়ি চলা যায় কি? আলো চলে সব চাইতে তাড়াতাড়ি—প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় এক লক্ষ নব্বই হাজার মাইল। তাহলে সেইরকম বেগে আলোর সওয়ার হয়ে ছোটা যাক্। পৃথিবীতে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে? এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট।



ক্লোরোফর্ম

আমরা মহাভারতে পড়িয়াছি, বিরাট রাজার গৃহে অজ্ঞাতবাসের শেষ-দিকে অর্জুন কৌরবদলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের মধ্যে তিনি সম্মোহন অস্ত্র মারিয়া শত্রুদলকে অজ্ঞান করিয়া ফেলেন? সম্মোহন অস্ত্রটা কিরূপ তাহা জানি না—কিন্তু আজকালকার ডাক্তারের এই বিদ্যাটি রোগীদের উপর অনেক সময়েই প্রয়োগ কারয়া থাকেন। ইহার ফলে, রোগীকে অজ্ঞান করাইয়া তাহার হাত পা কাটিয়া ফেলা হয়, অথচ রোগী তাহার কিছুই জানিতে পারে না। ব্যাপারটি অতি সহজ! রোগীর নাকের কাছে খানিকটা ঔষধ ধরিয়া তাহাকে শুঁকিতে দেওয়া হইল—রোগী সেই মিষ্টি গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে বেহুঁশ হইয়া গেল। বাস, তারপর চট্‌পট্‌ ছুরি চালাইয়া কাজ সারিয়া লইলেই হয়।

আফিং খাইলে বা অন্য নানারকম নেশা করিলে মানুষের জ্ঞান থাকে না। একবার একটা মাতাল নেশার ঘোরে খানায় পড়িয়া পা ভাঙিয়া ফেলে। ডাক্তার সেই নেশার অবস্থাতেই তাহার পায়ের অস্ত্র চিকিৎসা করেন—মাতাল তাহার বিছুমাত্র বুঝিতে পারে নাই। কোন অসুখের যন্ত্রণা যখন রোগীর পক্ষে অসহ্য হইয়া পড়ে ডাক্তারেরা তখন আফিং জাতীয় ঔষধ খাওয়াইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া রাখেন—সে ঘুমে শরীরের সমস্ত বেদনাবোধকে এমন অবশ করিয়া ফেলে যে, রোগী আর কোনরূপ যন্ত্রণা টের পায় না।

কিন্তু এরূপভাবে নেশা ধরাইয়া চিকিৎসা করার বিপদ অনেক। একে ত এই সকল ঔষধে শরীরের মধ্যে নানারূপ অনর্থ ঘটাইয়া থাকে,

চিকিৎসা শেষ হইবার বহু পরেও ঔষধের নানারূপ উৎপাত চলিতে থাকে। তাহার উপর আবার ঔষধের অভ্যাস একবার ধরিয়া গেলে—তাহাতে রোগীকে একবারে নেশার মতো পাইয়া বসে। তখন বিনা প্রয়োজনেও রোগী ঐ সকল ঔষধের জন্য পাগল হইয়া উঠে, এবং ঔষধের দাস হইয়া সমস্ত জীবনটিকে মাটি করিয়া ফেলে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১১৭ বৎসর পূর্বে হাম্‌ফ্রে ডেভি নামে একজন অসাধারণ ইংরাজ পণ্ডিত এক প্রকার 'গ্যাস' পরীক্ষা করিতেছিলেন। ইংরাজিতে ইহাকে 'ল্যাফিং গ্যাস' অর্থাৎ হাসাইবার গ্যাস বলা হয়। এই জিনিসটিকে নিশ্বাসের সঙ্গে টানিতে গেলে ঘাড়ে মাথায় কেমন সুর্‌-সুর্‌ করিতে থাকে, তাহাতে অনেকের হাসি আসে। ডেভি দেখিলেন, শুধু সুর্‌সুর্‌ করে তাহা নয়, একটু বেশি করিয়া টানিলে মানুষ অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এই রকমভাবে একটুখানি গ্যাস শুঁকাইয়া মানুষকে মিনিটখানেক বেশ আরাকে বেহুঁশ করিয়া রাখা যায়। তাহাতে খুব দুর্বল লোকেরও কোন অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না। ডেভি বলিলেন, 'এই উপায়ে বেশ সহজেই বিনা যন্ত্রণায় ছোটখাট অস্ত্র চিকিৎসা চলিতে পারে।' দুঃখের বিষয় সে সময়কার অস্ত্র চিকিৎসকেরা এ কথায় কান দেন নাই। চল্লিশ বৎসর পরে একজন আমেরিকান ডাক্তার এই গ্যাসের সাহায্যে বিনা যন্ত্রণায় একটি রোগীর দাঁত তুলিয়া দেখান যে, ডেভির কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। সেই অবধি নানারূপ ছোটখাট অস্ত্র চিকিৎসায়, বিশেষত দাঁতের ডাক্তারিতে এই গ্যাসের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু সামান্য এক মিনিট সময়ের মধ্যে ত আর রীতিমত অস্ত্র চিকিৎসা চলে না। সুতরাং অধিকাংশস্থলেই চিকিৎসার যন্ত্রণা দূর করিবার আর উপায় ছিল না। সেই সময়কার রোগীদের কাছে অস্ত্র চিকিৎসার মতো ভয়ানক জিনিস আর কিছু ছিল কিনা সন্দেহ। যে কয়েদীর প্রাণদণ্ড হইবে সে যেমন করিয়া ফাঁসির কথা ভাবে, রোগী

তেমনি করিয়া চিকিৎসার কথা ভাবিত। কবে 'অস্ত্র করা' হইবে, সেই ভাবনায় রোগী আগে হইতেই আধমরা হইয়া থাকিত। প্রায় সকল রোগীকেই ধরিয়া বাঁধিয়া জবরদস্তি করিয়া তবে ছুরি চালাইতে হইত। এই রকম যখন অবস্থা তখন আমেরিকা হইতে সংবাদ আসিল সেখানকার এক ডাক্তার 'ইথার' অর্থাৎ সুরা জাতীয় একপ্রকার ঔষধের সাহায্যে রোগীকে বহুক্ষণ নিরাপদে অজ্ঞান রাখিবার উপায় বাহির করিয়াছেন।

জেমস সিম্‌সন নামে একটি উৎসাহী চিকিৎসক সেই সময়ে এডিনবরায় চিকিৎসা করিতেছিলেন। ছাত্র অবস্থায় সেই সময়কার অস্ত্র চিকিৎসার ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া সিমসন এক সময়ে আরেকটু হইলেই ডাক্তারি ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতেন। বিনা যন্ত্রণায় চিকিৎসার কথা শুনিয়া তিনিও পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সিম্‌সনের কয়েকটি বন্ধুও তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। প্রতিদিন রাত্রে কয় বন্ধু মিলিয়া যত রাজ্যের ঔষধ শুঁকিয়া শুঁকিয়া নানারূপে তাহার নিশ্বাস লইয়া দেখিতেন—ঐ রকম অবসাদ আসে কিনা! এ বিষয়ে তাঁহাদের কিরূপ উৎসাহ ছিল সে সম্বন্ধে সিম্‌সনের কোন বন্ধু একটি সুন্দর গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ বন্ধুটির বাড়িতে একটি নূতন উগ্র ঔষধ দেখিয়া সিম্‌সন তৎক্ষণাৎ জিনিসটা বিষাক্ত কি না তাহার বিচার না করিয়াই তাহা লইয়া পরীক্ষা করিতে উদ্যত হন। কিন্তু বন্ধুটি বাঁধা দিয়া আগে দুইটা খরগোসের উপর তাহা প্রয়োগ করেন। ফলে দুইটা খরগোসই মারা যায়।

যাহা হউক, অনেক দিন ধরিয়া অনেক পরীক্ষার পর সিম্‌সন একদিন এক শিশি ক্লোরোফর্ম আনিয়া হাজির করিলেন। সেই দিন আহারের পর দুটি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া তিনি পরীক্ষায় বসিলেন। ক্লোরোফর্মের শিশিতে নাক গুঁজিয়া জোরে জোরে নিশ্বাস টানিতে টানিতে তিনজনেই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। যখন সিম্‌সনের জ্ঞান হইল তিনি দেখিলেন বন্ধু দুটি তখনও মোহের ঘোরে

বেহুঁশ হইয়া আছেন। তিনি উৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, 'ইথারের চাইতেও চমৎকার।'

সেইদিন হইতে চিকিৎসকগণ এই সম্মোহন অস্ত্রটিকে আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাহার ফলে অস্ত্র চিকিৎসার বিভীষিকা সাড়ে পনর আনা পরিমাণ দূর হইয়াছে। পূর্বে যে সকল অবস্থায় ছুরি ছোঁয়াইতে না ছোঁয়াইতে রোগী যন্ত্রণায় মারা যাইত—সেরূপ সাংঘাতিক ক্ষেত্রেও এখন আর রোগীর সে ভয়ের কারণ নাই।



বায়োস্কোপ

ঘরের বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে। চেয়ে দেখ, খাড়া খাড়া রেখার মতো বৃষ্টির ধারা পড়ছে। এক একটি ধারা একটি বৃষ্টির ফোঁটা ; কিন্তু ফোঁটাগুলো মোটেই ফোঁটার মতো দেখাচ্ছে না—দেখাচ্ছে ঠিক লম্বা লম্বা আঁচড়ের মতো। একটা দড়ির আগায় একটা পাথর বেঁধে যদি খুব তাড়াতাড়ি ঘোরাতে পার তাহলে দেখতে মনে হবে, যেন আস্ত চাকা ঘুরছে। কিন্তু তা বলে পাথরটা ঘুরবার সময় তা আর সত্যি করে চাকার মতো হয়ে যায় না। তবে এ রকম দেখায় কেন ?

অন্ধকার রাত্রে আকাশের গা দিয়ে যখন উল্কা ছুটে যায় তখন তাদেরও দেখায় ঠিক ঐ রকম একটানা লম্বা দাগের মতো। উল্কাটা জ্বলতে জ্বলতে যে পথ দিয়ে ছুটে গেল, মনে হয় যেন সেই পথের সমস্তটা গা অনেকখানি এক সঙ্গে জ্বলতে দেখলাম। কিন্তু আমরা জানি উল্কাটা সত্যি সত্যি একই সময়ে ততখানি লম্বা জায়গা জুড়ে ছিল না। সেটা আগে এখানে, পরে ওখানে, তারপর সেখানে, এমনি করে ক্রমাগত ছুটে চলেছে—কিন্তু সে খুব তাড়াতাড়ি চলছে বলে মনে হয় যেন একই সময়ে তাকে এখানে ওখাকে সেখানে দেখতে পাচ্ছি। বৃষ্টির ফোঁটার বেলাও তেমনি হয়। এই মাত্র তাকে দেখছি মাটির থেকে বিশ হাত উঁচুতে ; কিন্তু এই দেখাটুকু মন থেকে মুছতে না মুছতে সেই ফোঁটাটা একেবারে মাটি পর্যন্ত নেমে পড়ছে। তাই মনে হচ্ছে যেন একই সময়ে বিশ হাত উঁচু থেকে মাটি পর্যন্ত সমস্তটা জায়গা জুড়েই ফোঁটাটাকে দেখতে পাচ্ছি।

এই রকম পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, চোখ দিয়ে আমরা যা দেখি,

চোখের দেখা শেষ হলেও তাকে আমাদের মন খানিকক্ষণ পর্যন্ত ধরে রাখে। সে অতি অল্প সময়—এক সেকেণ্ডের পাঁচ ভাগের এক ভাগ, অথবা তার চাইতেও কম।

মনে কর, একটা ছবির দিকে তুমি তাকিয়ে আছে। আমি মাঝে থেকে তোমার চোখের সামনে আড়াল দিলাম, তুমি আর সে ছবি দেখতে পারছ না। যদি আড়াল সরিয়ে নেই, অমনি আবার দেখতে পাবে। যদি বারবার আড়াল দেই আর বারবারই সরাই, তাহলে মনে হবে, ছবিটা বারবার দেখা যাচ্ছে আর বারবার অদৃশ্য হচ্ছে। কিন্তু এই কাজটি যদি খুব তাড়াতাড়ি করতে পারি, অর্থাৎ মনে কর প্রতি সেকেণ্ডে যদি দশবার আড়াল পড়ে আর দশবার দেখতে পাও, তাহলে আর আড়াল দেওয়া টের পাবে না। মনে হবে আগাগোড়াই স্থিরভাবে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ। প্রথম যে ছবি দেখছ, তার জের ফুরোতে না ফুরোতে দ্বিতীয়বারের ছবিটা এসে পড়ছে। এই দ্বিতীয়-বারের 'রেশটুকু' থাকতে থাকতেই আবার তৃতীয়বারের ছবিটা চোখে পড়ছে। তাই মনে হয়, আগাগোড়াই সমান দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু ছবিটা যদি আগাগোড়া একই রকম না থেকে ক্রমাগত বদলিয়ে যেতে থাকে? মনে কর, একটা সং খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর ক্রমে সে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ছে, তারপর মাথা নীচু করে ঠ্যাং দুটোকে ঘুরিয়ে, কেমন ডিগবাজী খেয়ে, শেষটায় আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ছবিগুলো যদি খুব তাড়াতাড়ি একটার পর একটা ঠিকমত তোমার চোখের সামনে ধরে দেওয়া যায়, তাহলে তোমার মনে হবে সত্যি সত্যি যেন ছবিতে সঙটা ডিগ্‌বাজী খাচ্ছে।

আজকাল যে সহরে সহরে, এমন কি পাড়াগাঁয়ে পর্যন্ত লোকেরা বায়োস্কোপ দেখে তার সংকেতও এই রকম। খুব চটপট করে যদি কোন চলতি জিনিসের অনেকগুলো ফটো নেওয়া হয়, আর তারপর যদি সেই ফটোগুলোকে তেমনি তাড়াতাড়ি, সেকেণ্ডে ১০/১২টা করে

পর পর চোখের সামনে ধরে দেখান হয়, তা হলেই বায়োস্কোপ দেখান হল। মনে কর, বায়োস্কোপে তোমার ভাত খাওয়ার ছবি নেওয়া হচ্ছে। তাহলে কি রকম হবে?—প্রথম ছবিতে হয়ত তুমি ভাতের গ্রাস ধরেছ, তোমার মুখটা তখনও বোজা আছে। দ্বিতীয় ছবিতে থালা থেকে তোমার হাত উঠছে, মুখটাও একটু খুলতে চাচ্ছে। তারপর হাতটা ক্রমেই মুখের কাছে এগিয়ে আসছে আর মুখের হাঁ-টাও বেশ বড় হয়ে আসছে। তারপর হাত গিয়ে মুখে ঠেকছে, তারপর মুখের মধ্যে গ্রাস ঢুকছে ইত্যাদি।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে প্রথম যে বায়োস্কোপের ছবি তোলা হয়েছিল, সেই ছবি তুলবার জন্য চব্বিশটা ফটোগ্রাফের কল পর পর সাজান হয়েছিল আর প্রত্যেকটা কলের সামনে এক একটা সূতো এমনভাবে টেনে বাঁধা হয়েছিল যে একটা ঘোড়া কলের সামনে দিয়ে যেতে গেলেই সূতো ছিঁড়ে যাবে, আর ক্যামেরাতে ঘোড়ার ফটো উঠে যাবে। আজকালকার বায়োস্কোপ কলের বন্দোবস্ত এ রকম নয়। তাতে একটা লম্বা ফিতের উপর পর পর হাজার হাজার ছোট ছোট ফটো তোলা হয়। এক একটা ছবি ওঠে আর ফিতেটা এক এক ঘর সরে যায়। এমনি করে প্রত্যেক সেকেণ্ডে দশ বারোটা করে ফটো তোলা হয়—ঘণ্টায় প্রায় চল্লিশ হাজার।

এমন কলও তৈরি হয়েছে যাতে প্রতি সেকেণ্ডে পাঁচ হাজার ফটো তোলা যায়। এই রকম তাড়াতাড়ি ফটো তুলে তারপর যদি দেখাবার সময়ে বেশ ধীরে ধীরে সাধারণ বায়োস্কোপের ছবির মতো দেখান হয় তাহলে খুব দ্রুত ঘটনার ছবিও বেশ স্পষ্ট করে সহজ-ভাবে দেখবার সুবিধা হয়। একটা সাবানের বুদ্বুদের ভিতর দিয়ে বন্দুকের গুলি ছুটে গেলে বুদ্বুদটা কি রকম করে ফেটে যায়। চোখে দেখলে এই ব্যাপারটা হঠাৎ এক মুহূর্তে শেষ হয়ে যায়—বন্দুক ছুটল আর বুদ্বুদ ফাটল, এইটুকুই খালি বোঝা যায়। যে ব্যাপারটা ঘটতে অনেক সময় লাগে তাকেও বায়োস্কোপের

ছবিতে খুব অল্প সময়ের মধ্যে চটপট ঘটিয়ে দেখান যায়। ফুলগাছের টবে সবেমাত্র অঙ্কুর গজাচ্ছে, সেই অঙ্কুর থেকে গাছ হবে, সেই গাছ বাড়বে, তাতে কুঁড়ি ধরবে, তারপর ফুল ফুটবে—বসে বসে দেখতে গেলে কতদিন সময় লাগে। বায়োস্কোপে যদি তার ছবি তোল, এক এক দিনে দশ বারোটা বা পঁচিশ ত্রিশটা করে—আর দেখবার সময় চট্‌পট্‌ দেখিয়ে যাও—তাহলে দেখবে যেন চোখের সামনেই দেখতে দেখতে গাছ গজিয়ে বেড়ে উঠছে আর ফুল ফুটছে।



আকাশবাণীর কল

একজন বক্তা, তার তিন লক্ষ শ্রোতা! একজন কথা বলছে, বক্তৃতা করছে গান গাইছে বাজনা বাজাচ্ছে আর তিন লক্ষ লোক তার প্রত্যেকটি সুর পরিষ্কার করে শুনতে পাচ্ছে! কথাটা শুনতে কেমন অসম্ভব শোনায় না? কিন্তু আমেরিকার বড় বড় সহরে একরকম আজকাল প্রতিদিনই ঘটছে। আরো আশ্চর্য এই যে, এই তিন লক্ষ লোক, যারা সকলে মিলে বক্তৃতা শুনছে তারা সব এক জায়গায় বসে থাকে না; কেউ দুই মাইল চার মাইল, কেউ বিশ মাইল, পঁচিশ মাইল দূরে, যে যার ঘরে আরাম করে বসে বক্তৃতা শোনে। এমনকি দেড়শ দুশ মাইল দূর থেকেও লোকের বক্তৃতা শুনবার কোনও বাধা নাই। দু বছর আগেও এরকম হওয়া সম্ভব বলে লোকে মনে করতে পারত না। কিন্তু আজকাল বিনা তারের টেলিফোন হওয়াতে এসব সম্ভব এবং সহজ হয়েছে।

তুমি যখন কথা বল তখন তোমার গলার আওয়াজ চারিদিকে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। যতদূর পর্যন্ত সে আওয়াজ যায় ততদূর পর্যন্ত বাতাসে নানারকম ঢেউ খেলিয়ে যায়। মোটা গলার বড় বড় ঢেউ, সরু গলার ছোট ছোট ঢেউ। চেঁচিয়ে বললে বাতাসে জোরে জোরে ঢেউয়ের ধাক্কা লাগে, আস্তে বললে সে ঢেউ বাতাস ঠেলে বেশি দূর এগোতেই পারে না। কিন্তু যেমন করেই কথা বল আর যত জোরেই বল, খানিক দূর পর্যন্ত গিয়ে সে ঢেউ আপনি মিলিয়ে যাবে। তারপরে আর তোমার আওয়াজ পৌঁছবে না।

যে কলের সাহায্যে গলার আওয়াজকে, অথবা অন্য যে কোনরকম শব্দকে অনেক দূর পর্যন্ত পাঠিয়ে দেওয়া যায় তার নাম 'টেলিফোন'।

আজকাল অনেক বড় বড় সহরে টেলিফোন কল দেখতে পাওয়া যায়। লোকে একটা হাতলের মতন জিনিস কানে লাগিয়ে তার চোঙের ভিতর কথা বলে, আর অনেক দূরের লোক সেইরকম আর একটা কল কানে দিয়ে সে কথা শুনতে পায়। দুজনের মধ্যে খালি সরু তারের যোগ। সেই তারের ভিতর দিয়ে সারাক্ষণ বিদ্যুৎ চলে, আর সেই বিদ্যুতের স্রোত শব্দের ঢেউগুলোকে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় পৌঁছে দেয়, এই উপায়ে অনেক মাইল পর্যন্ত শব্দ পাঠান সম্ভব হয়।

কিন্তু গোড়ায় যে টেলিফোনের কথা বলা হয়েছে, যাতে তিন লক্ষ লোক একসঙ্গে টেলিফোনের আওয়াজ শুনতে পায়, তাতে তার-টার কিছুরই দরকার হয় না। তা যদি দরকার হত, তাহলে ভেবে দেখ কত লক্ষ মাইল তার বসাতে হত আর তার জন্য কত হাজার হাজার টাকা খরচ করতে হয়। তার বদলে এখন কেবল ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা খরচ করলেই তুমি তোমার ঘরে বসে বহু দূরের কথা ও গান-বাজনা অনায়াসে শুনতে পার।

আমেরিকায় এই সমস্ত টেলিফোনের কল তৈরি করা আজকাল একটা মস্ত ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা কল তৈরি করে তারা সহরের একটা কোনও জায়গার গান বাজনা ও বক্তৃতার ষ্টেশন বসায়। সেখানে বড় বড় কল থাকে, সেই কলে চোঙের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তারা বক্তৃতা করে, গায়কেরা গান গায়। বাতাসে যেমন সর্বদাই শব্দের ঢেউ খেলছে, আকাশেও তেমনি আলোর তরঙ্গ, বিদ্যুতের তরঙ্গ সর্বদাই খেলে বেড়াচ্ছে। ষ্টেশনের কলগুলির কাজ হচ্ছে সমস্ত কথা ও সুর-গুলিকে ধরে তা থেকে বিদ্যুতের তরঙ্গ সৃষ্টি করে তাকে আকাশময় ছড়িয়ে দেওয়া। বিদ্যুতের ঢেউগুলি শব্দের বাহন হয়ে চারিদিকে হাজার হাজার মাইল ছড়িয়ে পড়ে। সে শব্দ কানে শোনা যায় না, কারণ সে আর বাতাসের ঢেউ নয়, সে এখন বিদ্যুতের তরঙ্গ যখন তোমার বাড়িতে তোমার টেলিফোনের যন্ত্রে এসে আঘাত করে তখন সে আবার শব্দের ঢেউ হয়ে তোমার কানের ভিতরে কথা ও সুরের সৃষ্টি

করে। ষ্টেশনের যন্ত্রের সামনে যে কথা ও যেমন সুর শোনান হয় ঠিক সেই কথা তেমনি সুরে অতি পরিস্কারভাবে তুমি ঘরে বসেই শুনতে পারবে।

প্রতিদিন কোন সময়ে কি হবে তা সব আগে থেকে ঠিক করে দেওয়া থাকে। যেমন মনে কর বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে, সকাল বেলা আটটা থেকে নটা পর্যন্ত খবর শোনান হবে। সেই সময়ে যদি টেলিফোনে কান দিয়ে থাক তাহ্‌লে শুনতে পাবে যে একজন লোক পরিস্কার গলায় সেদিনকার সব খবর শোনাচ্ছে। তার আগের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যত দেশ থেকে যত রকমের বখর এসেছে, একে একে সব বলে যাচ্ছে। কোথায় যুদ্ধ-বিগ্রহ হল, কোথায় বড় বড় মন্ত্রিসভায় কি কি পরামর্শ স্থির হল, কোথায় কতরকমের কি দুর্ঘটনা ঘটল, এই সমস্ত খবর বলছে, তারপর ক্রিকেট, ফুটবল, ঘোড়দৌড় আর নানারকম খেলা ও আমাদের কথা বলছে, তারপর হয়ত নানারকম জিনিসের বাজার দর আর নানারকম ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বলছে। সকলের শেষে সেদিন কখন কি কি হবে তাও জানিয়ে দিচ্ছে—যেমন 'আজ তিনটের সময় ঘোড়-দৌড়ের ফল বলা হবে', 'পাঁচটার সময় অমুখ বিষয়ে অমুক বক্তৃতা করবেন,' 'সাতটা থেকে আটটা অমুক অমুক গাইয়ের গান শোনান হবে, তারপর এক ঘণ্টা নাচের বাজনা হবে,' 'নটার সময় ছোট ছেলেদের জন্য গল্প শোনান হবে।' আমেরিকায় এরই মধ্যে নানা সহরে সবশুদ্ধ কয়েক হাজার ষ্টেশন বসান হয়েছে। সেইসব ষ্টেশনের শ্রোতাদের সংখ্যা যে কত, তা এ থেকেই বুঝতে পারবে যে এক নিউইয়র্ক সহরেই তিন লক্ষের বেশি শ্রোতা প্রতিদিন বিনা তারে টেলিফোন শোনে।

অনেকগুলো ষ্টেশন মিলে যখন একসঙ্গে আকাশে ঢেউ ছড়াতে থাকে তখন অনেক লোকের একসঙ্গে কথা বলার মতো একটা ভয়ানক গোলমালের সৃষ্টি হতে পারে, সেইজন্য ষ্টেশনওয়ালারা নিজেদের মধ্যে একরকম বন্দোবস্ত করে নিয়েছে যে এক-এক ষ্টেশন থেকে খালি এক-

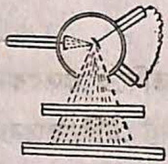
এরকম ঢেউ ছাড়া হবে। আকাশে যে বিদ্যুতের তরঙ্গ ওঠে তাকে ষ্টেশনওয়ালাদের ইচ্ছামত ছোট বা বড় করা যায়। যেমন একটা ষ্টেশন থেকে যদি একশ হাত লম্বা ঢেউ ছাড়া হয় তাহলে তার পাশের ষ্টেশন থেকে নব্বুই হাত কি একশ দশ হাত লম্বা ঢেউ ছাড়তে পারে, কিন্তু একশ হাত ঢেউ ছাড়বার হুকুম তাদের নেই। শ্রোতারা যে টেলিফোনের কল ব্যবহার করে তাতে এমন বন্দোবস্ত থাকে যে কল খালি একরকম বিদ্যুতের ঢেউয়েতেই সাড়া দিবে। বেহালার কানে মোচড় দিয়ে যেমন তারের সুর অনেকটা নামান বা চড়ান যায় তেমনি টেলিফোনের শব্দ ধরবার যন্ত্রটিকেও নানারকম ঢেউয়ের তালে চড়িয়ে বা নামিয়ে বাঁধা যায়। মনে কর তোমার টেলিফোনের কল এখন যেভাবে বাঁধা আছে তাতে একশ হাত ঢেউওয়ালা ষ্টেশনের শব্দ শোনা যেতে পারে। কিন্তু তুমি বিজ্ঞাপনে দেখলে, আজ সন্ধ্যার সময় নব্বুই হাত ঢেউয়ের ষ্টেশনেতে খুব বড় কোনও ওস্তাদ গান করবে, তুমি ইচ্ছা করলে তোমার কলের বাঁধন বদলিয়ে তাতে নব্বুই হাত তরঙ্গ ধরে সেই ষ্টেশনের গান শুনতে পার। যারা এইসব টেলিফোনের কল ব্যবহার করে কেবল তাদের জন্য এর মধ্যেই নানারকম খবরের কাগজ আর মাসিকপত্র বের হতে আরম্ভ করেছে। তাতে কোথায় কোন্ নূতন ষ্টেশন হচ্ছে, কখন কোথায় কি হবে, টেলিফোন কলের কি কি নতুন উন্নতি হচ্ছে, এই সমস্ত খবর থাকে। তাছাড়া কলওয়ালাদের নানারকম বিজ্ঞাপন থাকে, আর টেলিফোনের কল সম্বন্ধে আর তার ব্যবহার সম্বন্ধে নানারকম উপদেশ থাকে।

সাধারণত যেসব টেলিফোনের কল ব্যবহার হয়, তাতে কানের উপর চাকৃতির মতো বা চোঙার মতো টেলিফোনের মুখ বসিয়ে আওয়াজ শুনতে হয়। যতজন শ্রোতা ততগুলো চোঙা বা চাকৃতি দরকার। কিন্তু আর একটু বেশি টাকা খরচ করলে আর একরকমের টেলিফোনের কল পাওয়া যায় যাতে গ্রামোফোনের চোঙার মতো একটা মস্ত চোঙার ভিতর দিয়ে পরিষ্কার আওয়াজ বেরোতে থাকে।

পাঁচ সাতজন বা বিশ পঞ্চাশজন লোকে একসঙ্গে বসে সেই আওয়াজ শুনতে পারে।

বিনা তারের টেলিফোন হওয়াতে মানুষের যে কতদিকে কতরকম সুবিধা হচ্ছে তা আর বলে শেষ করা যায় না! ছোট্টখাট্ট টেলিফোনের কলটি তোমার পকেটে করে সঙ্গে নিয়ে যাও, পথের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা একটা বাতি বা থাম কিংবা টেলিগ্রাফ পোষ্টের গায়ে তার ঠেকিয়ে নিলেই কতরকম আওয়াজ শুনতে পারবে। যদি নিজের বাড়িতে কিংবা আপিসে একটি ছোটখাট ঢেউ পাঠাবার ষ্টেশন বসাও তাহলে বাড়ির লোকে বা আপিসের লোকে যখন ইচ্ছা তোমার খবর পাঠাতে পারবে। তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পার যে, যেখানেই থাক না কেন, হঠাৎ বিশেষ কোনও দরকার পড়লে কিংবা কোনও বিপদ-আপদ ঘটলে তখনি তোমার কাছে তার খবর পেঁছাতে পারবে।

এমনি করে 'যে গান কানে যায় না শোনা', যে গান আকাশের তরঙ্গে চড়ে বিদ্যুতের মতো বেগে চারিদিকে ছুটে বেড়ায়, সেই সশব্দ গানকে আকাশময় ছড়িয়ে দিয়ে মানুষ আবার তাকে কলের মধ্যে ধরে আকাশের ভাষা ও আকাশের সুর শুনছে। আমাদের দেশে গল্পে ও পুরাণে যে আকাশবাণীর কথা শুনতে পাই—এও যেন সেই আকাশ-বাণীর মতো কোথাও কোন আওয়াজ নাই, জনমানুষের সাড়া নাই, অথচ কলের মধ্যে কান দিলেই শুনি আকাশময় কত কণ্ঠের কত ভাষা, কত বিচিত্র গান আর কত যন্ত্রের সুর!



আশ্চর্য আলো

আজকাল সহরে বিদ্যুতের আলো দেখা যায়। জাহাজে রেলগাড়িতে সাবধানেই 'বিজলীবাতি'র আমদানি হইয়াছে। জল জোগাইবার জন্য রাস্তায় যেমন নল বসান হয়, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পাঠাইবার জন্য সেইরকম লোহা বা তামার তার খাটাইতে হয়। জলের কারখানায় বড় বড় দমকলের চাপে জল ঠেলিয়া উচুতে তোলে, সেই তোলা-জল সহরের নল বাহিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বিদ্যুতের ব্যবস্থাও কতকটা সেই-রকম—বিদ্যুতের কারখানায় বড় বড় কলে বিদ্যুৎ জমাইয়া রাখে, আর সেই বিদ্যুৎ আপনার চাপে তারের পথ ধরিয়া বহু দূর পর্যন্ত ছুটিয়া যায়। নলের মুখ বন্ধ থাকিলে যেমন জল আর চলে না, তেমনি তার কাটিয়া দিলে বা কোনখানে তারের জোড় খুলিয়া গেলে বিদ্যুতেরও চলার পথ বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু জলের চাপ যদি খুব বেশি হয়, তবে সে অনেক সময়ে সকল বাধা ঠেলিয়া আপনার পথ করিয়া লয়—জলের তোড়ে রাস্তাঘাট ভাসাইয়া বিষম কাণ্ড উপস্থিত করে। সেইরকম বিদ্যুতের প্রবল স্রোত যদি সহজ পথ না পায় তবে সেও আকাশ চিরিয়া জোর করিয়া আপনার পথ কাটিতে জানে। ঝড়ের সময়ে আকাশ ফুঁড়িয়া মেঘে মেঘে বিদ্যুতের হাসাহাসি চলে, সেই পথহারা বিদ্যুৎ পৃথিবীর ঘাড়ে পড়িলে যে ভয়ানক কাণ্ড হয়, তাহারাই নাম 'বাজ পড়া'। নর্দমা কাটিয়া যেমন জল সরায়, বুদ্ধিমান মানুষে তেমনি বাড়ির পাশে লোহার শিক খাড়া করিয়া বিদ্যুতের জন্য সহজ পথ করিয়া রাখে।

পণ্ডিতেরা বোতলের ভিতরে এইরকম বিদ্যুৎ ছুটাইয়া অনেক

আশ্চর্য পরীক্ষা করিয়াছেন। বোতলটাকে খালি করিয়া তাহার মধ্যে বিদ্যুৎ চালাইলে অতি অদ্ভুত রঙিন আলোর খেলা দেখা যায়। কেবল রঙের খেলা নয়, পণ্ডিতেরা তাহার মধ্যে এমন সব আশ্চর্য কাণ্ড দেখিতে পান যে তাহার আলোচনার জন্যই কত লোকে সারা জীবন ভরিয়া খাটিতেছেন।

বোতলকে 'খালি' করার কথা বলিলাম কিন্তু তাহার অর্থ কি? সাধারণত, আমরা যাহাকে 'খালি বোতল' বলি তাহা মোটেও খালি নয়, কারণ, তাহার ভিতরটা আগাগোড়াই বাতাসে পোরা। সেই বাতাসকে কলে চুষিয়া বাহির করিলে যাহা থাকে পণ্ডিতেরা তাহাকে বলেন ভ্যাকাম অর্থাৎ ফাঁকা আকাশ। এইরকম একটা বোতলের দুই দিকে তার জুড়িয়া তাহার মধ্যে বিদ্যুতের ঝিলিক্ চালাইলে দেখা যায় যে সেই ফাঁকা বোতলের মধ্যে বিদ্যুতের এক নূতন চেহারা বাহির হয়। বিদ্যুতের তেজ স্নিগ্ধ জ্যোতির মতো বোতলের এক মাথা হইতে আর এক মাথায় ছড়াইয়া পড়ে, আর বোতলের ভিতরটা আশ্চর্য সুন্দর আলোয় ভরিয়া জ্বল্ জ্বল্ করিতে থাকে।

দেখিবার জিনিস এবং শিখিবার জিনিস ইহার মধ্যে এত আছে যে সেসব কথা আজ আর বলিবার সময় নাই, কেবল একটা আশ্চর্য ব্যাপারের কথা এখানে বলিব। তাহার কথা তোমরা অনেকে হয়ত শুনিয়াছ—তাহার নাম 'রঞ্জেনের আলো' বা এক্স-রে (অজানা আলো)। ফাঁকা বোতলের মধ্যে বিদ্যুতের আঘাতে এই আশ্চর্য আলোর জন্ম হয়। কাঁচ ফুড়িয়া সেই আলো বাহিরে চলিয়া আসে, কিন্তু তাহাকে চোখে দেখা যায় না।

কোন কোন জিনিস আছে, তাহারা নানারকম তেজ শুষিয়া সেই তেজে আবার আপনি আলো দিতে থাকে। একরকম পাথর দেখা যায়, তাহারা দিনের আলোক জমাইয়া রাখে আর অন্ধকারে জ্বল্‌জ্বল্ করে। রাত্রে সময় দেখিবার জন্য আজকাল একরকম ঘড়ি কিনিতে পাওয়া যায়, তাহার কাঁটা ও সময়ের অঙ্কগুলো আপনার আলোয়

টিম্‌টিম্‌ করিয়া জ্বলিতে থাকে। আজকাল যুদ্ধেও এইরূপ মশলা-মাখান একপ্রকার রঙের ব্যবহার হয়; যেখানে শত্রুর ভয়ে ভালরকম আলো জ্বালিবার উপায় নাই সেখানে এই জ্বলন্ত রঙের চিহ্ন আঁকিয়া নানারকম সংকেত জানান হয়, অন্ধকারে পথ দেখাইয়া চলাফেরার সুবিধা করা হয়।

ফাঁকা বোতলের ঐ অদৃশ্য তেজ ধরিবার জন্যও নানারকম মশলা পাওয়া যায়। একটা পর্দার উপর সেই মশলা মাখাইয়া তাহাকে ঐ বিদ্যুৎ-পোরা বোতলের কাছে আনিলেই পর্দাটা আলো হইয়া ওঠে। বোতলটাকে কালো কাগজে মুড়িয়া ফেল, তবুও পর্দা জ্বলিতে থাকিবে। বোতলের উপর কাঠের বাক্স চাপা দেও—কাঠ ভেদ করিয়া সে অদৃশ্য আলো মশলার পর্দাকে জ্বালাইয়া তুলিবে। কিন্তু বিদ্যুৎ চালান একটিবার বন্ধ করিয়া বোতলের তেজ নিভাইয়া দাও, সেই সঙ্গে পর্দার আলোও নিভিয়া যাইবে। পর্দার সামনে যদি একখানা লোহার টুকরা ধর, তাহা হইলেও যেখানে লোহার আড়াল পড়িয়াছে সেইখানে পর্দা জ্বালিবে না—কারণ বোতলের আলো লোহার ভিতর দিয়া যাইতে পারে না। একটা পয়সা আনিয়া পর্দার সামনে ধর, তাহারও পরিস্কার গোল ছায়া পড়িবে। এইরকম পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, পর্দার উপর হাড়ের ছায়া পড়ে কিন্তু মাংস বা চামড়ার কোন ছায়া পড়ে না।

এইজন্য পর্দার সামনে তোমার জামাশুদ্ধ হাতখানা ধরিলে তোমার জামাও দেখিবে না আর নথরপুষ্ট মাংস ভরাট আঙুলও দেখিবে না—দেখিবে কতগুলো হাড়ের ছায়া।

একটি কাঠবিড়ালের ছবি তোল। ছবিতে হাড়গোড় সবই উঠিবে, অথচ অমন জমকালো ল্যাজটির চিত্রমাত্র থাকিবে না। জ্যান্ত জীবের এরকম কঙ্কালছায়া সর্বপ্রথম দেখেন রঞ্জেন বা রণ্ট্‌গেন সাহেব, তিনিই ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ ২২ বৎসর আগে ঐরূপ জ্বলন্ত পর্দার সাহায্যে এই আলো আবিস্কার করেন। প্রথম যখন তিনি পর্দার সামনে হাতের আড়াল দিয়া দেখেন তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে কতকগুলো হাড়ের ছায়া দেখিবেন। তাই হঠাৎ আপনার 'হাড্ডিসার' ছায়া দেখিয়া

তিনি ভারি আশ্চর্য বোধ করিয়াছিলেন।

তামাসা হিসাবেও এটা একটা দেখিবার মতো ব্যাপার, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কাঠের বাক্সের মধ্যে চামড়ার ব্যাগ, কাগজ, কলম, হাড়ের বোতাম, ছুঁচসূতা, চাবি ভরিয়া একবার পর্দার আলোর সামনে ধর—কাঠের বাক্স ছায়াতে কাঁচের মতো স্বচ্ছ দেখাইবে আর তাহার ভিতরকার ছুঁচ চাবি আর কলমের মুখটা স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িবে। বোতামের দিকে ছায়া দেখা যাইবে কিন্তু কাগজ সূতা বা চামড়ার ব্যাগ খুঁজিয়া পাওয়া মুস্কিল হইবে—অথচ ব্যাগের ভিতর যদি টাকা পয়সা থাকে তাহারও পরিস্কার ছায়া পড়িবে।

কিন্তু পণ্ডিতেরা কেবল তামাসা দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকে না, তাঁহারা ইহার নিয়ম কানুন বাহির করিয়া ব্যাপারটাকে অনেকরকম কাজে লাগাইয়াছেন। ডাক্তারেরা এই আলোকের সাহাযে রোগীর দেহ পরীক্ষা করিতেছেন, নানারকম কৌশল করিয়া জ্যান্ত মানুষের বুকের ধুক্‌ধুকানি আর পাকস্থলীর হজমক্রিয়া দেখিতেছেন, শরীরের ভিতরে কোথায় হাড় ভাঙিল, কোথায় গুলি লাগিল, কোথায় উৎকট রোগের সঞ্চার হইল, সব চোখে দেখিয়া ব্যবস্থা করিতেছেন। আজকালকার যুদ্ধে কত হাজার হাজার সৈন্য এই আলোকে পরীক্ষা করিয়া আঘাতের রকমটা স্পষ্ট বুঝিয়া তাহার চিকিৎসা করা হইতেছে। ব্যবসা বাণিজ্যের নানান জিনিসের ভেজাল ধরিবার জন্য নানারকম খুঁৎ পরীক্ষার জন্যও এই আলোর ব্যবহার হয়। প্রথম যাঁহারা এই সকল পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, এ আলো কি সাংঘাতিক জিনিস! অদৃশ্য আলোয় ক্রমাগত কাজ করিতে করিতে অনেকের চোখ অন্ধ হইয়াছে, হাতে সাংঘাতিক ঘা হইয়া হাতটি নষ্ট হইয়াছে, এমনকি কেহ কেহ প্রাণ পর্যন্ত দিয়াছেন। এমন সর্বনেশে আলো।

তোমাদের কাহারও মনে কি এমন অহঙ্কার আছে যে তোমার চেহারাটি খুব সুন্দর? যদি থাকে, তবে একটিবার এই আলোতে ঐ মুখখানির ফটো তুলাইয়া দেখ। তাহলে বোধহয় আর রূপের দেমাক থাকিবে না।



ভূমিকম্প

দুপুরবেলায় দিব্য আরামে শুইয়া বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় দুরদুর দুরদুর করিয়া ঘরবাড়ি কাঁপিয়া উঠিল, ঝাড় লণ্ঠন পাখা সব দুলিতে লাগিল, তারপর খাট চৌকি সবসুদ্ধ খটাখট করিয়া ঝাঁকানি লাগাইয়া দিল যে, আর নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করা সম্ভব হইল না। ততক্ষণে চারিদিকে লোকজনের ছুটাছুটি আরম্ভ হইয়াছে, শাঁক কাঁসর ঘণ্টার শব্দ শুনা যাইতেছে আর সকলেই বলিতেছে 'ভূমিকম্প, ভূমিকম্প।' পরের দিন কাগজে ভূমিকম্পের নানারকম বর্ণনা বাহির হইল—কেমন করিয়া বড় বড় গির্জার চূড়াগুলি দুলিতে দুলিতে পড়ো পড়ো হইয়াছিল, কেমন করিয়া হাইকোর্টের জজসাহেব হইতে উকিল ব্যারিষ্টার পেয়াদা পর্যন্ত সবাই ছুটিয়া বাহির হইয়াছিল, কেমন করিয়া দোকানের বাবুরা আর আপিসের বড় বড় সাহেবরা দোকানপাট কাগজপত্র সব ফেলিয়া রাস্তায় ছুটিয়া বাহির হইয়াছিল ইত্যাদি অনেক কথা। আর জানা গেল এই যে, কেবল যে কলিকাতাতেই ভূমিকম্প হইয়াছে তাহা নয়, বাংলার নীচুজমি হইতে আসামের পাহাড় পর্যন্ত সব জায়গাতেই সেই এক কাঁপনি।

শাস্ত্রে যে বলে পৃথিবীটা স্থির আর 'অচলা', পণ্ডিতেরা সে কথা অনেকদিনই মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছেন। পৃথিবীর যে শূন্যের মধ্যে প্রকাণ্ড চক্র আঁকিয়া সূর্যের চারিদিকে ছুটিয়া চলে এবং চলিতে চলিতে লাটিমের মতো ঘুরপাক খায়, এ সকল কথা আমরা সকলেই জানি। সে চলুক আর ঘুরুক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই—কারণ সেটা আমরা টের পাই না, কিন্তু মাঝে মাঝে সে আবার গা ঝাড়া দেয় কেন?

পাহাড় পর্বত কাঁপাইয়া, জমি জাঙ্গাল ফাটাইয়া, বাড়ি ঘর দুয়ার উল্টাইয়া এ আবার কেমন উপদ্রব? সেদিন যে ভূমিকম্প হইল, সে ত নেহাৎ সামান্য রকমের। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এ দেশে যে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে অনিষ্ট করিয়াছিল আরও অনেক বেশি। সেবারে পূর্ববাংলায় আর আসামে অনেক লোক মারা পড়িয়াছিল এবং কলিকাতা শহরেও বড় বড় কোঠা দালান ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। আর রেলপুল টেলিগ্রাফের থাম কত যে নষ্ট হইয়াছিল তাহার আর সংখ্যা নাই।

'ভূমিকম্প' মানে মাটির কাঁপুনি। এ কাঁপুনি ত বলিতে গেলে রোজই কতবার করিয়া হইতেছে। রাস্তা দিয়া দমকল ছুটিয়া গেল, মাটি গুম্ গুম্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এমন কি একজন মোটা লোক যদি সিঁড়ি দিয়া খুব উৎসাহ করিয়া নামিতে যায়, তাহাতেও বাড়ির ভিতরে ছোটখাট রকমের 'ভূমিকম্প' হয়। যদি বেশ সূক্ষ্মরকম যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, তবে পাশের ঘরে বিড়াল হাঁটিয়া গেলে এই ঘরে তাহার চলা-ফিরার সাড়া পাইবে। কিন্তু ভূমিকম্প বলিতে আমরা এ রকম কাঁপনি বুঝি না। মাটির ভিতর হইতে যে ধাক্কা আসে, মাটির তলে তলে যাহা বহুদূর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে, তাহারই নাম ভূমিকম্প। কোথায় খাসিয়া পাহাড়ের মধ্যে মাটির নীচে কোন গভীর তলে একটু নাড়াচাড়া পড়িয়াছে আর সমস্ত বাংলা দেশটা ভূমিকম্পের ধাক্কায় কাঁপিয়া উঠিয়াছে। সিমলা পাহাড়ে আর লঙ্কা দ্বীপে পর্যন্ত কম্পনলিপি যন্ত্রে তার স্পষ্ট সাড়া পাওয়া গিয়াছে। বাস্তবিক, যাঁহারা এই সকল সূক্ষ্ম যন্ত্রের হিসাব লইয়া কারবার করেন, তাঁহারা বলেন প্রায় প্রতিদিনই পৃথিবীর নানাস্থানে ছোট বড় নানারকমের ভূমিকম্প চলিতেছে। কয়েক বছর আগে যখন আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো নগরে বড় ভূমিকম্প হইয়াছিল তখন এখানকার যন্ত্রে তাহা ধরা পড়িয়াছিল। কম্পনলিপি যন্ত্রের কাঠি একটা কাগজের উপর সাদা আঁচড় কাটিয়া চলে। যতক্ষণ ভূমিকম্পের গোলমাল না থাকে

ততক্ষণ সে বারবার সোজা রকমের রেখা টানিয়া যায়, কিন্তু মাটির তলায় কোথাও যদি ভূমিকম্পের ছোঁয়া লাগে, অমনি কলের কাঠি বিগড়াইয়া হিজিবিজি আঁচড় কাটিতে আরম্ভ করে।

বাহির হইতে এই মাটির দিকে চাহিয়া দেখ, মনে হয় তাহার মতো অটল স্থির আর কিছুই নাই। চারিদিকে সমুদ্রের অশান্ত ঢেউ খ্যাপার মতো লাফালাফি করিতেছে, মাথার উপরে চঞ্চল বাতাস দিনরাত ছুটিয়া মরিতেছে, কিন্তু পৃথিবী, সে ধীর গম্ভীর নিশ্চল। বড় বড় গাছপালা হইতে সামান্য ঘাসটা পর্যন্ত তাহার গায়ে শিকড় বসাইয়া তাহার বুক ফুঁড়িয়া বাহির হইতেছে, পৃথিবী তাহাতে আপত্তিও করে না, বাধাও দেয় না। কিন্তু, কেবল বাহিরের মূর্তি না দেখিয়া যদি একবার গভীর মাটির নীচে ঢুকিতে পার তবে বুঝিবে তার ভিতরটার কেমন তোলপাড় চলিতেছে। সেখানে গেলে মনে হইবে পৃথিবীর বুকের ভিতর যেন আগুন জ্বলিতেছে; যতই তার ভিতরে ঢুকি ততই গরম। সেই গরমে পাথর পর্যন্ত গলিয়া যায়, তুমি আমি ত এক মুহূর্তেই ঝামা হইয়া পুড়িয়া যাইব।

পৃথিবীর এই মাটির খোলসটি আগাগোড়া সমান নয়। কত লক্ষ লক্ষ যুগ নানারকম পাথর স্তরের পর স্তর সাজাইয়া তবে এই খোলস গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত কঠিন স্তর আগুনে গরম হইয়া, চাপে কঠিন হইয়া, দিনরাত ঠেলাঠেলি করিতেছে। কোথাও পাথর গলিয়াছে, জল ফুটিয়া বাষ্প হইতেছে, তাহারা বাহির হইবার পথ চায়। কোথাও মাটির নীচে বড় বড় ফাটল রহিয়াছে, পাশের মাটি উপরের চাপে তাহার মধ্যে ধসিয়া পড়ে; কোথাও নীচেকার গরমের ঠেলায় উপরের মাটি কাঁপিয়া ফুলিয়া উঠে। দিন রাত যুগের পর যুগ এই রকম চাপাচাপি ঠেলাঠেলি চলিয়াছে। গরমে বাষ্প আর গলিত পাথর যদি বাহির হইবার সহজ পথ না পায় তবে তাহারা অনায়াসেই একটা ভূমিকম্প বাধাইয়া তুলিতে পারে। আগ্নেয়গিরির উৎপাতের কথা তোমরা শুনিয়াছ। এই সব পাহাড়ের উৎপাত সকলের চাইতে সাংঘাতিক

হয়, সেই সময়ে যখন পাথর জমিয়া তাহার মুখ বন্ধ হইয়া যায়। তখন তাহাদের ভিতরের আগুন আর বাহির হইবার পথ পায় না, কেবল তাহার চাপ জমিয়া জমিয়া ভিতরে ভিতরে গুমরাইতে থাকে। ভিসুভিয়াসের অত্যাচারে পম্পিয়াই শহর ধ্বংস হইবার আগে এই রকম একটা কাণ্ড হইয়াছিল। সে সময়ে পাহাড় দেখিতে বেশ শান্ত ছিল, কিন্তু ক্রমাগত কয়েক বৎসর ধরিয়া গুম গুম শুনা যাইত, মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় মাটি কাঁপিয়া উঠিত, আর ঘন ঘন ভূমিকম্প হইত। কিন্তু সে সময়ে মানুষ বুঝিতে পারে নাই যে এই সমস্তই পাহাড় ফাটাইবার আয়োজন। এইরূপে ভিতরের চাপ জমিয়া জমিয়া এমন ভয়ংকর হইয়া উঠে যে পাহাড় আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না—জ্বলন্ত পাথর পাহাড় ভেদ করিয়া ফোয়ারার মধ্যে ছুটিয়া বাহির হয়। এই রকম ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে কতবার ঘটিয়াছে তাহার আর সংখ্যা নাই।

এক একটা আগুনের পাহাড়কে অনেকদিন চুপচাপ থাকিতে দেখিয়া কত সময়ে লোকে মনে করে তাহার ভিতরকার আগুন মরিয়াছে—কিন্তু আবার যখন সে কুম্ভকর্ণের মতো ভয়ংকর মূর্তিতে জাগিয়া উঠে তখন মানুষের আতঙ্কের আর সীমা থাকে না। এইরকম যত উৎপাতের কথা শুনা গিয়াছে, তাহার মধ্যে ক্রাকাতোয়ার অগ্নিকাণ্ডই সকলের চাইতে ভয়ানক। সুমাত্রা ও যবদ্বীপের মাঝামাঝি একটা দ্বীপ আছে তাহারই নাম ক্রাকাতোয়া। সেই দ্বীপের মধ্যখানে প্রকাণ্ড পাহাড় ছিল, এককালে তাহার মাথায় আগুন দেখা যাইত। দুই শত বৎসর ধরিয়া সেই পাহাড় একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া বিশ্রাম করিতেছিল, এই সুযোগে তাহার চারিদিকে গাছপালা গজাইয়া রীতিমত বনজঙ্গল দেখা গিয়াছিল। এমন সময়ে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। সে কম্প এক একটি বড় সামান্য নয়, কারণ সমুদ্র পার হইয়া অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত মাঝে মাঝে তাহার ধাক্কা পৌঁছাইত। তিন বৎসর ভূমিকম্পের পর সহস্র কামান গর্জনের মতো ভীষণ শব্দে পাহাড় ভেদ

করিয়া আগুন আর গরম বাষ্পের প্রকাণ্ড স্তম্ভ বাহির হইল। সেই স্তম্ভ সাত মাইল উঁচু হইয়া চারিদিকে গরম ধূলা ছাই আর পাথর ছিটাইতে লাগিল। এইরূপ তিন মাস পাথর বৃষ্টি করিয়াও পাহাড়ের তেজ কমিল না। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ২৬ আগষ্ট সন্ধ্যার পর সমুদ্র হইতে জাহাজের নাবিকেরা দেখিয়াছিল, পাহাড়ের চারিদিকে লাল ধোঁয়ার আকাশ ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যে আগুনের গোলা ছুটিতেছে, বিদ্যুৎ চমকাইতেছে এবং ঘন ঘন বাজ পড়িতেছে। তাহার পরদিন ভোরবেলা একশত মাইল দূরে বাটাভিয়া শহরে গরম ধূলার বৃষ্টি হইল এবং তাহার কয়েক ঘণ্টা পরেই অসম্ভব ভয়ংকর শব্দে ক্রাকাতোয়ার প্রকাণ্ড পাহাড় আকাশে উড়িয়া গেল। আট মাইল ডাঙা বেমালুম শূন্যে মিলাইয়া গেল, গভীর সমুদ্র আসিয়া তার স্থান দখল করিল। সেই শব্দের ধাক্কা তিন হাজার মাইল দূর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল, আকাশ তোলপাড় করিয়া সমস্ত পৃথিবীময় বাতাসের ঢেউ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। হাজার হাজার মণ পাথর চূর্ণ হইয়া ধূলার মতো আকাশের দিক্‌দিগন্তে ভাসিয়া গিয়াছিল এবং পৃথিবীর সকল দেশে উদয়াস্তের সময় আশ্চর্য রঙের খেলা দেখাইয়াছিল।

এখানেও তাহার শেষ হয় নাই; পাহাড় ফাটিবার সময় সমুদ্রের ভিতর পর্যন্ত আগুন ঢুকিয়াছিল এবং ভীষণ ভূমিকম্পে সমুদ্রকে তোলপাড় করিয়া তুলিতেছিল। তাহার উপর যখন পাহাড় উড়িয়া সমুদ্রের মধ্যে গিয়া পড়িল তখন সমুদ্র একেবারে প্রলয়মূর্তি ধারণ করিয়া ফুলিয়া পাহাড় সমান উঁচু হইয়া ডাঙার উপর ছুটিয়া পড়িল। শহর গ্রাম ঘর বাড়ি গাছপালা পলকে কোথায় ভাসিয়া গেল। এই দুর্ঘটনার ফলে প্রায় চল্লিশ হাজার লোক মারা পড়ে, অনেক জাহাজ ডুবিয়া যায়, আর সুণ্ডা প্রণালীর চেহারা একেবারে বদলাইয়া যায়। সমুদ্রের ঢেউ এমন বেগে আসিয়াছিল যে একটা জাহাজকে পাওয়া যায় সমুদ্র হইতে তিন মাইল দূরে শুকনা ডাঙার উপরে। ইহার তুলনায় আমাদের সেদিনকার ভূমিকম্পটাকে অবশ্য নিতান্তই সামান্য ব্যাপার বলিতে

হইবে। তাহার সঙ্গে অগ্নিবৃষ্টি, পাহাড়বৃষ্টি বা সমুদ্রের ঢেউ এ সব কোন হাঙ্গামা ছিল না।

পৃথিবীর মাটি কোঁকড়াইয়া বড় বড় পাহাড় পর্বতের সৃষ্টি হয়। সেই সব পাহাড় উঠিবার সময়ে মাটির স্তরগুলোকে বাঁকাইয়া ভাঙিয়া উলট-পালট করিয়া দেয়। যে মাটি সমানভাবে শোয়ান ছিল তাহাকে খাড়া করিয়া ঝুলাইয়া দেয়। কঠিন পাথরকে ঠেলিয়া নরম মাটির মধ্যে বসাইয়া দেয়, নরম মাটিকে চাপ দিয়া পাথরের ফাটলে ফোকরে ঢুকাইয়া দেয়, পাথরকে পিষিয়া ভাঙিতে চায়। এইরূপে সমস্ত পাহাড়-শুদ্ধ টলমল করিয়া উঠে। এই সকল কাণ্ড প্রতি মুহূর্তেই চলিয়াছে। ধীরে ধীরে যুগের পর যুগ পাহাড়ের স্তর সরিয়া সরিয়া একদিন হয়ত একেবারেই বেসামাল হইয়া টলিয়া পড়িল। নরম মাটির ভিতর পাহাড় বসিতে বসিতে একদিন হঠাৎ পিছলাইয়া ধসিয়া গেল। দুই দিকের উল্টা চাপে ফুলিতে ফুলিতে একদিন পাহাড়ের দেমাক ফাটিয়া চৌচির হইল, এই রকমে বহুদিনের ঠাসাঠাসি ঠেলাঠেলি এক একদিন হঠাৎ ভূমিকম্পের আকারে গা-ঝাড়া দিয়া বাহির হয়।

ভূমিকম্পের ধাক্কা মাটির ভিতর দিয়া ঢেউয়ের মতো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সেই ঢেউয়ের আঘাতে কেমন করিয়া পৃথিবী টল্‌মল্‌ করিতে থাকে, তাহার সামান্য একটু নমুনা তোমরা দেখিয়াছ। তাহাতে ঘরবাড়ি ভাঙিয়া পড়ে, পথঘাট ফাটিয়া যায়, রেলের লাইন মোচড়াইয়া বাঁকিয়া যায়। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকার কুইটো শহরে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহাতে শহরের কোন কোন জায়গায় মানুষ-গুলিকে ফুটবলের মতো ছুঁড়িয়ে দিয়াছিল। তাহার একশত বৎসর পূর্বে পোর্টরয়ালের ভূমিকম্পে বাজারের ভিড়কে ছিটাইয়া নীচে বন্দরের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছিল। লিসবনের ভূমিকম্পে নদীতে বান ডাকিয়া শহরের অসংখ্য লোককে ডুবাইয়া দিয়াছিল। কয়েক বৎসর আগে সানফ্রান্সিসকো শহরে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল সে কেবল বাড়ি ঘর ফেলিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, গ্যাসের নল আর বিদ্যুতের তার ভাঙ্গিয়া

জড়াইয়া সে শহরে আগুন লাগাইয়া দেয়। সে এমন সর্বনেশে আগুন যে শহরের সমস্ত দমকল মিলিয়েও তাহাকে কিছুমাত্র জব্দ করিতে পারে নাই। তারপরে শহরের কর্তারা বোমবারুদ ফাটাইয়া আগুনের আশে-পাশে অনেকগুলি বাড়ি উড়াইয়া দিয়া মনে করিলেন আগুন আর ছড়াইতে পারিবে না। কিন্তু আগুন প্রায় সিকি মাইল ফাঁকা জমি টপ্‌কাইরা শহরের আর একদিকে ফুটিয়া বাহির হইল। যাহা হউক, খানিক বাদে বাতাসের মুখ ঘুরিয়া গেল তাই রক্ষা, তাহা না হইলে শহরের চিহ্নমাত্র থাকিত কিনা সন্দেহ।

ভূমিকম্পে অনেক সময়ে পাখিরা ব্যস্ত হইয়া উড়িতে থাকে। ডাঙার জন্তু ছুটাছুটি আর চিৎকার করিতে থাকে। একটা হাতির কথা শুনিয়াছি, সে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের, বড় ভূমিকম্পের সময়ে প্রথমটা অবাক হইয়া চারিদিকে তাকাইতেছিল, তারপর কাঁপুনি যখন বাড়িয়া উঠিল তখন সে প্রাণপণে চার পা ছড়াইয়া মাটি আঁকড়াইয়া চিৎকার করিতে লাগিল। গল্প শুনিয়াছি, একটা বাড়ির পাঁচিলের উপরে দুইটি বিড়াল মুখামুখি বসিয়া সুর ভাঁজিতেছিল, এমন সময়ে ভূমিকম্পের ধাক্কায় দুই-জনকেই পাঁচিল হইতে ফেলিয়া দেয়। সংগীতচর্চায় হঠাৎ এ রকম বাধা পাইয়া তাহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিবার জোগাড় করিতেছিল, এমন সময়ে পাঁচিল ভাঙিয়া দুচারখানা ইট পড়িতেই তাহাদের যুদ্ধের উৎসাহ থামিয়া গেল। আর এক নাবিকের পোষা টিয়াপাখির গল্প শুনিয়াছি, সে আশ্চর্যরকম কথা বলিতে পারিত। একবার ভূমিকম্পে সে খাঁচাশুদ্ধ ঘরচাপা পড়িয়াছিল। পরে শোন গেল ভাঙা ঘরের তলা হইতে কে যেন চিৎকার করিয়া গালাগালি করিতেছে। তখন ইট সরাইয়া দেখা গেল, পাখিটা খাঁচার মধ্যে এক জায়গায় কোণঠাসা হইয়া বসিয়া আছে, আর বলিতেছে 'বড় গরম, বড় গরম।'



শরীরের মালমশলা

এখানে একটা বাক্স আছে। বাক্সটা কাঠের তৈরি। শুধু কাঠ? না, না, তাতে লোহার কব্জা আর তালা, আর চারধারে পিতলের কাজ আছে। আর কি আছে? আর তার গায়ে চক্‌চকে গালা বার্নিশ আছে। সামনে ঐ একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে? ইট কাঠ লোহা চূন সুরকি বালি সিমেন্ট বা রং তেল, এইরকম সব জিনিস। এই সমস্ত হল তার মালমশলা। যারা বাড়ি বানায় তারা হিসাব করে বলতে পারবে, এতে অমুখ জিনিস এতখানি আন্দাজ লেগেছে—তার বাজার দাম এত। আচ্ছা—সামনে একটা মানুষ বসে আছে—বল ত কিসের তৈরি মানুষ? কিসের তৈরি, তার একটু নমুনা শুনবে?

দু মণ ওজনের একটি মানুষের শরীরের মধ্যে হিসাব করলে একমণ জল পাওয়া যাবে—বেশ বড় বড় তিন-চার কলসী জল। তার শরীরে যতরকম গ্যাস বাষ্প বা বাতাস আছে তা যদি আলগা করে বার করতে চাও- তাহলে যত গ্যাস বেরোতে পারে যে তার জন্য ১২ হাত লম্বা ১২ হাত চওড়া ৮ হাত উঁচু একটা ঘর লাগবে। তার মধ্যে এমন অনেকখানি গ্যাস পাবে বাজারে যার দাম আছে—বিক্রি করতে পারলে প্রায় টাকা দশেক পাওয়া যায়।

ঐ ওজনের একজন সাধারণ মানুষের গায়ে যত চর্বি আছে তা দিয়ে এক পোয়া ওজনের প্রায় গোটা ত্রিশেক মোমবাতি তৈরি হতে পারে। তাছাড়া খাঁটি অঙ্গার বা মূল-কয়লা এত পাওয়া যাবে যে তা দিয়ে দশ

হাজার পেন্সিলের শিষ তৈরি হতে পারে। বারো সের পাথুরে কয়লার মধ্যেও অতখানি অঙ্গার থাকে না।

খোঁজ করলে একটা শরীরের মধ্যে থেকে প্রায় কুড়ি চামচ নুন আর দু-তিন মুঠো চিনি অনায়াসেই বার করা যেতে পারে।

যে সমস্ত জিনিস না হলে শরীর টিঁকতে পারে না তার একটি হচ্ছে লোহা। এই যে রক্তের রং দেখছ, টকটকে লাল, শরীরে লোহা কম পড়লেই সে রং ফ্যাকাশে হয়ে যায়, মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে, কঠিন ব্যারাম দেখা দেয়। তখন মানুষের লোহা মেশান ওষুধ খাওয়াতে হয়। শরীরে যে লোহার মশলা থাকে, ইচ্ছা করলে তা থেকে লোহা ধাতু বার করে খাঁটি শক্ত লোহা বানান যায়। একজন সুস্থ মানুষের শরীর চমৎকার শান দেওয়া বা পালিশ করা হয়।

এক একরকম কাজের জন্য এক একরকম লোহা। আজকাল ভাল ইস্পাত ও উঁচুদরের লোহা করিতে হইলে আগে খাঁটি কাঁচা লোহা তৈয়ারি করা হয়। তারপর তাহার সঙ্গে ঠিক দরকার মত অন্য কোন ধাতু বা কয়লা প্রভৃতি মিশাইয়া আবার, সমস্তটা গলাইয়া একসঙ্গে জ্বাল্ দিয়া লইতে হয়। প্রথম কাজটির জন্য বিশেষরকম চুল্লির দরকার হয়—তাহার গঠন এবং ভিতরকার বন্দোবস্ত সাধারণ চুল্লির মতো নয়। একটা প্রকাণ্ড পিপার মতো জিনিস—তাহার মধ্যে পাঁচশ বা হাজার মণ মশলা ধরে; সেই পিপার তলার দিকে আগুন জ্বালাইয়া, তাহার ভিতর দিয়া ঝড়ের মতো দমকা বাতাস চালাইয়া দেওয়া হয়। বাতাসের ঝাপটায় আগুনের শিখা প্রকাণ্ড জিভ মেলিয়া পিপার মুখ হইতে ছুটিয়া বাহির হয়। লোহার মশলা আগুনের তেজে গলিয়া পুড়িয়া যতই বিশুদ্ধ হইয়া আসিতে থাকে। প্রথমে বেগুনি, তারপর ক্রমে লাল হলদে সাদা হইয়া, শেষে যখধ ঘোর নীল রং দেখা দেয় তখন আগুনের তেজ নিভাইয়া, প্রকাণ্ড পিপাটিকে কলে ঘুরাইয়া কাৎ করিয়া, তাহার ভিতর হইতে তরল কাঁচা লোহা ঢালিয়া ফেলা হয়। তারপর ওজনমত

নানা জিনিসের মিশাল দিয়া সেই লোহাকে নানা কাজের উপযুক্ত করিতে হয়।

এখানেও কি হাঙ্গামার শেষ আছে? সেই লোহাকে আরও কতবার অগ্নি পরীক্ষায় ফেলিয়া, কত দূরমুষ কলে সাংঘাতিকভাবে দলিয়া পিষিয়া, কতরকমের উৎপাত সহাইয়া তবে তাহাকে ভারি ভারি কঠিন কাজে লাগান চলে।



আশ্চর্য প্রহরী

বড় বড় রাজা রাজড়া বা লাট বেলাট যখন সমরোহ করে বেড়াতে বেরোন তখন তাঁদের সঙ্গে কতগুলি 'বডি-গার্ড' বা 'শরীররক্ষক' ঘোড়ায় চড়ে যায়। তারা যখন নিশান উড়িয়ে বাহার দিয়ে চলে, তখন দেখতে বেশ জমকাল দেখায়। কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যায়, এ ছাড়া তাদের আর বিশেষ কিছু কাজ করবার থাকে না। বছরের পর বছর কেটে যায় কিন্তু কারও শরীর রক্ষা করবার জন্য তাদের ডাক পড়ে না।

আমাদের শরীরে কোথায় কি হচ্ছে তাই নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁরা বলেন, তুমি আমি রাম শ্যাম সকলের সঙ্গেই—এ রকম দু'দশটা নয়, একেবারে লাখে লাখে, 'বডি-গার্ড' ঘুরে বেড়াচ্ছে। দিন-রাত ছুটোছুটি করে পাহারা দিচ্ছে, শত্রুর সঙ্গে লড়াই করবার জন্য দিনরাত প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। শত্রু ধরবার জন্য এত ব্যস্ততা কেন? এত শত্রুই বা কোথায়? শত্রু চারিদিকেই। আকাশে বাতাসে রোগের বীজ সব কিল্‌বিল্ করে উড়ে বেড়াচ্ছে। তারা নিশ্বাসের সঙ্গে নাক দিয়ে, গলা দিয়ে একেবারে ফুসফুসের ভিতর পর্যন্ত ঢুকে যাচ্ছে, আর কতরকম জ্বরজারি সর্দিকাশির হাঙ্গামা বাধাচ্ছে। জলের সঙ্গে দুধের সঙ্গে নানারকম খাবারের সঙ্গে প্রতিদিন হাজার হাজার রোগের বীজ শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। কোথাও একটু ঘা হলে বা কেটে গেলে সেই ফাঁক দিয়ে কত সাংঘাতিক ব্যারামের বীজ অনায়াসে ভিতরে ঢুকে অনর্থ বাধাবার চেষ্টা করছে। যদি বাঁচতে হয় তাহলে এই সমস্ত শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখা দরকার। তাই, ধূলিকণার চাইতেও সূক্ষ্ম যে শত্রু যাকে দেখতে হলে অণুবীক্ষণ লাগাতে হয়, তার সঙ্গে

সারাদিন লড়াই করবার জন্য শরীরের মধ্যে আশ্চর্য রকম সূক্ষ্ম ব্যবস্থা করা রয়েছে।

আমাদের শরীরটা এমনভাবে তৈরি যে তার যেখানেই কাটো সেখানেই রক্ত বেরোয়। কোথাও একটা ছুঁচের সমান সরু জায়গা খুঁজে পাবে না যার মধ্যে খোঁচা দিলে রক্ত গড়ায় না। শরীরে যতক্ষণ প্রাণ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত রক্তটা ক্রমাগত শরীরময় ছুটোছুটি করে বেড়ায়। তাও এলোমেলোভাবে ছুটবার হুকুম নাই। ঠিক তালে তালে, সারাদিন সারা বছর সারা জীবন তাকে পথ ধরে ধরে চলতে হয়, এক মুহূর্ত বিশ্রাম করবার উপায় নাই। এইভাবে সর্বদা তাকে চালা-বার জন্য শরীরের মধ্যে আশ্চর্য 'পাম্পকল' বসান আছে। বুকের মাঝখানে যে জায়গাটা সর্বদা ধুক্‌ধুক্ করে, যাকে আমরা 'হার্ট' বা হৃৎপিণ্ড বলি, সেইটে হচ্ছে আমাদের পাম্পকল।

ঘরে ঘরে কলের জল পেতে হলে তার জন্য সহরের এক এক জায়গায় ষ্টেশনে করে প্রকাণ্ড কলকারখানা বসাতে হয়: সেই ষ্টেশনের সঙ্গে বড় বড় 'পাইপ' জুড়ে সহরময় জল চালাবার ব্যবস্থা করতে হয়; তারপর সেই মোটা পাইপের গায়ে সরু মোটা মাঝারি নানারকম নল লাগিয়ে ঘরে ঘরে জল আনতে হয়। শরীরের রক্ত চলবার ব্যবস্থাটাও অনেকটা এই রকমের। হৃৎপিণ্ডটা হল আমাদের কলের ষ্টেশন। শরীরের মোটা মোটা শিরাগুলি সেই ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, ঠিক যেন রাস্তার নীচে জলের পাইপ। তাদের গা থেকে আবার সরু সরু নলের মতো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা বেরিয়ে সমস্ত শরীর ছেয়ে ফেলেছে—সুতোর মতো সরু চুলের মতো সরু তার চাইতেও আরও অনেক সরু। বুকের ধুক্‌ধুকানির তালে তালে শরীরের রক্ত শিরার ভিতর দিয়ে চলতে থাকে। চলতে চলতে যায় কোথায়? আর কোথাও যাবার যো নাই, বার বার সেই হৃৎপিণ্ডের মধ্যেই ফিরে আসতে হয়।

আমরা যতক্ষণ বেঁচে থাকি ততক্ষণ শরীরটা ক্রমাগত ক্ষয় হতে

থাকে। যত বেশি কাজ করি, যত বেশি চিন্তা করি, যত বেশি কথা বলি, যতই নড়িচড়ি, চলি ফিরি, শরীর ততই বেশি বেশি ক্ষয় হতে থাকে। কয়লা না পোড়ালে যেমন এঞ্জিন চলে না তেমনি শরীরকে ক্ষয় না করলে শরীরের কাজ হয় না। কিন্তু কেবলই যদি ক্ষয় হতে থাকে তাহলে শরীর টিঁকবে কি করে? সে জন্য শরীরকে রোজ নিয়মিত খাবার যোগাতে হয়। সেই খাওয়া হজম হলে শরীরের রক্ত তাকে নানা কৌশলে চারিদিকে বয়ে নিয়ে সব রকমের ক্ষয় দূর করে। শরীর শুধু যে ক্ষয় হয় তা নয়; কয়লা পুড়লে যেমন ধোঁয়া বেরয়, ঝুল জমে আর ছাই পড়ে থাকে তেমনি শরীরের ক্ষয়ের দরুণ নানা রকমের দূষিত আবর্জনা শরীরের সর্বত্র জমে উঠতে থাকে। সেই আবর্জনা দূর করাও রক্তের কাজ। হৃৎপিণ্ডের ভিতর থেকে যে পরিষ্কার টাটকা লাল রক্ত বেরিয়ে আছে সেই রক্ত যেখানে যায় সেখানকার ময়লা সাফ করতে করতে শেষটায় নিজেই ক্রমে ময়লা হয়ে পড়ে। সেই ময়লা দূষিত রক্ত আবার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ফিরে এসে ফুস্‌ফুসের তাজা বাতাস খেয়ে টক্‌টকে তাজা হয়ে ওঠে।

এক-ফোঁটা রক্ত যদি অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখ তাহলে দেখতে দেখাবে কালো কালো চ্যাপ্টা মতো। ঐ গোল গোল জিনিসগুলির আসল রং লাল। ঐগুলির জন্য রক্তের রং লাল দেখায়, তা না হলে রক্তের কোনও রং নাই। এই লাল-দানা বা কণিকাগুলির এক একটা এত ছোট যে এক ফোঁটা রক্তের মধ্যে ওরকম লাখে লাখে কণিকা ভেসে বেড়ায়। এই লাল জিনিসগুলোর ফাঁকে ফাঁকে সাদা মতন কি দেখা যাচ্ছে; সেইগুলিই হচ্ছে শরীরের প্রহরী বা 'বডি-গার্ড।' লাল দানা-গুলি কেবল কুলি আর ধাঙরের কাজ করে বেড়ায়। শরীরের ময়লা সাফ করা, শরীরকে ধুয়ে মুছে বাতাস খাইয়ে তাজা রাখা, এ সবই হচ্ছে ঐ লাল কণিকাদের কাজ। কিন্তু, শত্রুর সঙ্গে যখন লড়াই করতে হয় তখন ডাক পড়ে ঐ সাদা প্রহরীদের।

যেমনি শরীরে রোগের বীজ ঢোকে অমনি চারিদিকে সাড়া পড়ে

যায়। আর প্রহরীরা দলে দলে রক্তের স্রোতে ভেসে রোগের সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে দেয়। টপাটপ্ রোগের বীজ খেয়ে ফেলতে থাকে। লড়াই যখন সঙ্গীন হয় তখন দলে দলে প্রহরী মরতে থাকে, আবার নূতন প্রহরীর দল দ্বিগুণ উৎসাহে লড়তে আসে। এ রকম ছোট ছোট লড়াই শরীরের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই চলছে। মানুষের রোগ যখন সাংঘাতিক হয়, তখন প্রহরীরা কিছুতেই আর রোগের বীজগুলোর সঙ্গে লড়াই করে পেরে ওঠে না তখন মানুষের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয়। যখন রোগের বীজ ক্রমশই শরীরটাকে দখল করতে থাকে তখন শরীরময় হৈচৈ পড়ে যায়, 'আরো প্রহরী পাঠাও, আরো প্রহরী পাঠাও।' শরীরের কারখানায় তখন লাখে লাখো শ্বেত কণিকা হতে থাকে। শরীরের মরণ-বাঁচন অনেকটা তাদেরই হাতে।

মনে কর তোমার হাতে এক জায়গায় একটুখানি কেটে গেছে। যেখানে কাটে সেখান দিয়ে ত রক্ত বেরোবেই কিন্তু ক্রমাগতই যদি রক্ত বের হতে থাকে, তাহলে সে ত বড় মারাত্মক কথা, তাই শরীর প্রথমেই চেষ্টা করে রক্ত থামাতে। রক্ত থামবার উপায়টি বড় চমৎকার; রক্তটা বাইরে এসে আপনা থেকেই কাটা ঘায়ের মুখে ছিপির মতো জমাট বেঁধে যায়। তখন সেই জায়গাটা যদি অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখ তাহলে দেখবে হাজার হাজার লাল কণিকা তার মধ্যে তাল পাকিয়ে মরে আছে। সাদা প্রহরীরাও ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে না। তারা সব ছুটে এসে মরা লাল কণিকাগুলিকে খেয়ে খেয়ে সাফ করতে থাকে, আর কাটা চামড়ার জায়গায় নূতন চামড়া গজাবার ব্যবস্থা করতে থাকে। কাটা ঘায়ের মুখটি হচ্ছে রোগের বীজ ঢুকবার খোলাপথ; যদি তেমন তেমন বীজ সেখানে দিয়ে ঢুকতে পারে, তাহলেই শীঘ্র শীঘ্র ঘা শুকাবার পক্ষে মুস্কিল হয়, সামান্য একটা ঘা পেকে বা পচে উঠে বিষম কাণ্ড বাধিয়ে তোলে। তখন প্রহরীদের খাটুনিও খুব বেড়ে যায় ঘা পাকলে তা থেকে যে পুঁজ বেরোর তার মধ্যে দেখা যায় অসংখ্য শ্বেত-কণিকা মরে আছে, আর তার মধ্যে রোগের বীজাণু কিল্‌বিল্ করছে।

পৃথিবীর শেষ দশা

সংসারের কোন জিনিসই চিরকাল একভাবে থাকে না—তা সে ছোটই হউক। এই যে প্রকাণ্ড পৃথিবীটা যাহার উপর তোমার আমার মতো কোটি কোটি জীব এমন নিশ্চিন্তে বসিয়া দিন কাটাইতেছে, এই পৃথিবীটাও চিরকাল এমন ছিল না। এক সময়ে—সে কত লক্ষ বৎসর আগেকার কথা তাহা জানি না—এই পৃথিবী এমন গরম ছিল যে, জীবজন্তু থাকা ত দূরের কথা, ইহার উপর বৃষ্টি পড়িবারও যো ছিল না। উপরের আকাশে বৃষ্টি জমিয়া নীচে পড়িতে না পড়িতে শূন্যেই বাষ্প হইয়া মিলাইয়া যাইত। যখন আরেকটু ঠাণ্ডা হইল তখন তেমন বৃষ্টি হইলে তাহা পৃথিবীতে আসিয়া পড়িত কিন্তু জল দাঁড়াইবার উপায় ছিল না। বৃষ্টিধারা ডাঙায় নামিবামাত্র টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিত এবং চারিদিক গরম ধোঁয়ায় ঢাকিয়া আকাশের জিনিস আকাশেই ফিরিয়া যাইত। তখন দেখিবার কেহ ছিল না, শুনিবার কেহ ছিল না, ফুটন্ত বৃষ্টিধারার অবিশ্রাম গর্জনের মধ্যে ধোঁয়ায় ভরা আকাশ যখন পৃথিবীর উপর ঘনঘন বিদ্যুতের চাবুক মারিত তখনকার সে ভয়ংকর দৃশ্য কল্পনা করাও সহজ কথা নয়।

তাহারও পূর্বে এক সময়ে পৃথিবীটা প্রকাণ্ড আগুনের পিণ্ডমাত্র ছিল। তখন তাহার শরীরটি ছিল এখনকার চাইতে প্রায় লক্ষগুণ বড়। বেশ একটি ছোটখাট সূর্যের মতো সে আপনার প্রচণ্ড তেজে আপনি ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিত। তাহারও পূর্বেকার অবস্থা কেমন ছিল সে কথা পণ্ডিতেরা আলোচনা করিয়াছেন। যাহা হউক, মোট কথা এই যে, পৃথিবীর বয়স অনেক হইয়াছে। মানুষের বয়স বাড়িয়া যখন সে বৃদ্ধ হইতে চলে তখন তাহার শরীরের তেজ কমিয়া যায়, গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া আসে। পৃথিবীর এটা কোন্ বয়স? সে কি এখন প্রৌঢ়

বয়স পার হইতেছে? ভাবিবার কথা বটে। পৃথিবীর শেষ বয়সটা কিরকম হইবে, তাহার পক্ষে বার্ধক্যই বা কি আর মৃত্যুই বা কি, তাহার বিচার করা দরকার।

মানুষের মরিবার নানারকম উপায় আছে। কেহ অল্পে বৃদ্ধ হইয়া মরে, কেহ বা তাহার পূর্বেই মরে, কেহ বহুদিন রোগে ভুগিয়া মরে, কেহ দুর্ঘটনায় হঠাৎ মরে। পৃথিবীর বেলায় মৃত্যুটা কিরকমে ঘটিবে তাহা কে জানে? যদি বৃদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে অল্পে অল্পেই মরিতে হয় তবে কোন্ অবস্থাকে তাহার মৃত্যুর অবস্থা বলিব? যখন জীবজন্তু থাকিবে না, নদী সমুদ্র থাকিবে না, পৃথিবী শুকাইয়া চাঁদের মতো কঙ্কালসার হইয়া পড়িবে তখন বলা যাইবে 'পৃথিবীটা মরিয়াছে। সেরকম হইবার কোন লক্ষণ দেখা যায় কি? যায় বৈ কি! পৃথিবী শূন্যে ছুটিয়া চলে তখন সে বাতাসটাকেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলে বটে, কিন্তু তবু কিছু বাতাস চারিদিকে ছিটাইয়া পড়ে, তাহা শূন্যে উড়িয়া যায় আর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে না। সেই বাতাসের মধ্যে যেটুকু জল বাষ্প হইয়া থাকে তাহাও এইরূপে আকাশে ছড়াইয়া পড়ে। এইভাবে যাহা নষ্ট হয় তাহার পরিমাণ খুবই সামান্য, কিন্তু সামান্য লোকসানও যদি ক্রমাগত লক্ষ লক্ষ বৎসর চলিতে থাকে তবে শেষে তাহার হিসাবটা খুব মারাত্মক হইয়া পড়ে। নদীও সমুদ্রের মধ্যে যে জল আছে ডাঙার মাটি তাহাকে প্রতিদিনই অল্পে অল্পে শুষিয়া লইতেছে এবং তাহাতেও জলটা দিন দিনই কমিয়া আসিতেছে, সুতরাং আজ না হউক, জল বাতাস সব একদিন শেষ হইবেই। তখন মেঘ থাকিবে না, কুয়াশা থাকিবে না, রামধনুকের শোভা, উদয়াস্তের রঙের খেলা কিছুই থাকিবে না—কেবল নিস্তব্ধ নির্জন শ্মশানের মতো পৃথিবীর মৃত কঙ্কাল পড়িয়া থাকিবে।

কিন্তু দিনের পর রাত, রাতের পর দিন, এই যে আলো আঁধারের অবিশ্রাম খেলা, ইহাও কি চিরকাল থাকিবে না? না, তাহাও থাকিবে না। মোটামুটি আমরা যে দিনরাতের হিসাব ধরি সেই দিনরাতের

হিসাবও ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। জোয়ার ভাঁটার আঘাত পৃথিবীকে প্রতিদিনই সহিতে হয়, জলের সঙ্গে ডাঙার ঘষাঘসি প্রতিদিনই বাধিয়া থাকে ; তাহার ফলে, পৃথিবীর ঘোরপাকের বেগ ক্রমেই ঢিলা হইয়া পড়িতেছে। পাঁচ লক্ষ বৎসরে দিনরাতের পরিমাণ এক সেকেণ্ড বাড়িয়া যাইবে এবং ক্রমেই আরো বেশি করিয়া বাড়িবে। শেষে এমন দিন আসিবে যখন এক পাক ঘুরিতে তাহার এক বৎসর লাগিবে। চাঁদ যেমন তাহার একই মুখ পৃথিবীর দিকে রাখিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, তাহার উল্টা পিঠ আমাদিগকে দেখিতেই দেয় না, পৃথিবীর ঠিক তেমনি করিয়াই ক্রমাগত একইভাবে সূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহার চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে। বুধ ও শুক্রগ্রহের আজকালকার অবস্থা ঠিক এইরূপ। এ অবস্থায় যেখানে রাত সেখানে বারো মাসই রাত, যেখানে দিন সেখানে বারো মাস দিনের আর শেষ নাই। একদিক রোদে পুড়িয়া ঝল্‌সিয়া ঝামা হইয়া যায়, আর একদিকে শীতে জমিয়া এমন কন্‌কনে ঠাণ্ডা যে বাতাস জমিয়া বরফ বাঁধিয়া যায়! শেষ বয়সে, যতদিন সূর্যের তেজ থাকিবে, ততদিন এইরকম করিয়াই পৃথিবীর দিন চলিবে। তারপর সূর্যও যখন নিভিয়া যাইবে তখনও অন্ধকারে আকাশের গায়ে কত লক্ষ লক্ষ তারার আলো এমনি করিয়াই চাহিয়া থাকিবে, কিন্তু বহুদূরের সেই জ্যোতিতে আলো-হারা সূর্যকে আর খুঁজিয়াই পাওয়া যাইবে না, পৃথিবী ত কোন্ ছার।

পৃথিবীর মৃত্যুর কি আর কোন উপায় নাই? হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া তাহার জীবনটা কি নষ্ট হইতে পারে না? ধূমকেতুকে এক সময়ে লোকে বড়ই ভয় করিত। নয় বৎসর আগে এই পৃথিবীটা যখন 'হালি'র ধূমকেতুর ল্যাজের ভিতর ঢুকিয়া গিয়াছিল তখন আগে হইতেই কত লোকে ভয় পাইয়াছিল, কত লোকে বলিয়াছিল যে এইবার পৃথিবীর আর রক্ষা নাই! কিন্তু তবু পৃথিবীর ত কোন ক্ষতি হয় নাই, বরঞ্চ ধূমকেতু কত উল্কাবৃষ্টির হাত হইতে সে কতবার বাঁচিয়া আসিল ; কিন্তু ধূমকেতুর চাইতে ভারি একটা কিছুর সহিত যদি তাহার

ধাক্কা লাগে তাহা হইলে অবস্থাটা খুবই সাংঘাতিক হইতে পারে। সুতরাং সেই 'একটা কিছু' আসা সম্ভব কি না, আর আসিলে কি হইবে, তাহার একটু খবর লওয়া যাক্।

পৃথিবীর দেহের বাঁধন ও চালচলন এমন হিসাব-মাফিক সুন্দর নিয়মে বাঁধা যে হঠাৎ কিছু উলটপালট হওয়া সম্ভব নয়। ভূমিকম্প ঝড়বৃষ্টি অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি যেসব ব্যাপারকে আমরা খুব ভয়ানক মনে করি, পৃথিবীর গায়ে সেগুলি সামান্য আঁচড় বা ফোস্কার মতো। চন্দ্র সূর্য গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি সকলকেই অতি আশ্চর্য নিয়মের বাঁধনে নিরাপদ করিয়া বাঁধা হইয়াছে। সুতরাং বাহির হইতে একটা কোন উপদ্রবকে হাজির না করলে সূর্যের এই প্রকাণ্ড সংসারটির বাঁধন ভাঙা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। সূর্যদেব সপরিবারে শূন্যের ভিতর দিয়া ঘণ্টায় চল্লিশ হাজার মাইল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন—কিন্তু আকাশের কূল কিনারা নাই, লক্ষ লক্ষ বৎসর ক্রমাগত ছুটিয়াও তিনি যে কোনদিন কোন তারার উপর গিয়া পড়িবেন, এমন আশঙ্কার কোন কারণ এ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। কিন্তু চোখে দেখা যায় না এমনও ত অনেক বিপদ থাকিতে পারে। আকাশে যত তারা আছে তাহাদের সকলেরই যে আলো আছে এমন নয়। যাহাদের আলো নিভিয়া গিয়াছে আমরা তাহাদের কোন খবর পাই না। সেইরূপ কোন তারা যদি অন্ধকার পথে চলিতে চলিতে সূর্যের উপর আসিয়া পড়ে, তবে অবস্থাটা কেমন হইবে? সেটা যে একেবারেই ভাল হইবে না তাহা বুঝিতেই পার।

তেমন একটা তারা যদি আসে তবে সে সূর্যের রাজ্যের সীমানায় আসিবার পূর্বেই নেপচুন প্রভৃতি বহু দূরের গ্রহগুলির চালচলন বিগড়াইতে আরম্ভ করিবে। পণ্ডিতেরা ব্যস্ত হইয়া হিসাব করিতে বসিবেন, উপদ্রবটা কত বড়, কত দূরে এবং কোন্‌দিকে। সূর্যের আলোয় সেই অন্ধকার তারা ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে, ক্রমে সে সৌর-জগতের ভিতরে আসিয়া পড়িবে। ততদিনে বড় বড় গ্রহেরা পর্যন্ত তাহাদের বহুদিনের অভ্যস্ত চাল ভুলিয়া বেচাল চলিতে আরম্ভ

করিবে। একদিকে সূর্য আর একদিকে নূতন অতিথি, এই দোটানায় পড়িয়া পৃথিবী টল্‌মল্ করিতে থাকিবে। জোয়ারের বিপুল টানে নদীর জল ফুলিয়া উঠিবে, সাগরের তরঙ্গ ভীষণ বেগে পৃথিবীর উপর ছুটিয়া পড়িবে, ভূমিকম্পে পাহাড় পর্বত ধসিয়া পড়িবে বহুদিনের ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি আবার জাগিয়া সহস্র মুখে আগুন ফুঁকিতে থাকিবে। আর জীবজন্তুর হাহাকার ডুবাইয়া ঝড়ের বাতাস পাগলের মতো ছুটিয়া ফিরিবে। তারপর যখন সূর্যে তারায় সংঘর্ষ বাধিবে তখনকার অবস্থা কল্পনা করাও অসম্ভব। মুহূর্তের মধ্যে এক সূর্য কোটি সূর্যের তেজ ধারণ করিবে, সূর্যের আগুন অসম্ভব বেগে সমস্ত গ্রহ চন্দ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। আবার সেই আদিকালের নীহারিকার মতো জ্বলন্ত বাষ্পের আগুন সমস্ত সৌরজগতের আকাশ জুড়িয়া জ্বলিতে থাকিবে। তারপর কত যুগযুগান্তর পরে তাহার ভিতর হইতে আবার নূতন সূর্য বাহির হইয়া নূতন উৎসাহে নূতন সংসার পাতিয়া বসিবে। এ পৃথিবী তখন না থাকুক, আবার নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি হওয়াই বিচিত্র কি?

ইহার মধ্যে অসম্ভব কিছুই নাই। সেদিন যে হঠাৎ নূতন তারা দেখা গিয়াছিল তাহাও সুদূর আকাশে এইরূপ কোন দুর্ঘটনার সামান্য একটু নমুনা মাত্র। আমাদের এই ছোট জগৎটুকুর মধ্যে যদি তেমন কোন প্রলয় আসিয়া পড়ে, তবে বিপদের সম্ভাবনা বুঝিবার পর সমস্ত শেষ হইতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর সময় লাগিবে। সুতরাং অন্তত আরও চল্লিশটা বছর তোমরা সকলেই খুব নিশ্চিন্ত থাকিতে পার।

—:*:—